# সানাউল্লাহর মহাবিপদ

হুমায়ূন আহমেদ

# সূচিপত্র

১. সানাউল্লাহ কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার ..... 2
২. ডা. আবু করিম ..... 15
৩. খাটের নিচে হমড়ু বসা ..... 31
৪. সকাল আটটা বাজার আগেই ..... 45
৫. পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর ..... 65
৬. ভূত-বিষয়ক রচনা ..... 80
৭. ভূত বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত থিয়সফিস্ট ..... 92
৮. তিনদিন হলো আইনুদ্দিন মহানন্দে ..... 103
৯. সানাউল্লাহর সামনে রূপবতী ..... 118
১০. জাবিন দুবাই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে এসেছে ..... 129
১১. হোপ ক্লিনিক ..... 147

# ১. সানাউল্লাহ কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার

সানাউল্লাহ কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। অতীশ দীপঙ্কর রোডে একটা টিনশেড বাড়িতে একা থাকেন। সবাইকে বলে বেড়ান–সুখে আছিরে ভাই, মহাসুখে আছি। ব্যাংকের হিসাব মিলানোর ঝামেলা নাই, হাজিরা দেবার ঝামেলা নাই। পায়ের ওপর পা তুলে সুখে জীবনপাত। আমার মতো সুখী বাংলাদেশে আরো আছে বলে মনে হয় না।

তার কাজের ছেলের নাম রফিক। সে বাজার করে, রান্না করে এবং রাতে খাবার পর সানাউল্লাহর সঙ্গে ডিভিডি প্লেয়ারে হিন্দি ছবি দেখে। তিনি রফিককেও প্রায়ই বলেন, রফিক, এর নাম সুখ। ইংরেজিতে বলে হ্যাপিনেস। দিনের শেষে আরাম করে ছবি দেখা, রাত দশটায় ঘুমুতে যেতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজনে এক রাতে পরপর তিনটা ছবি দেখতে পারি। কিংবা সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়তে পারি। পারি না?

পারেন স্যার।

মনে কর এক রাতে আমরা অমিতাভ বচ্চনের তিনটা ছবি দেখলাম। রাতটার নাম দিলাম অমিতাভ নাইট। নাইট মানে রাত। অমিতাভের রাত। কেমন হয়?

রফিক সব দাঁত বের করে বলল, ভালো হয় স্যার। বুড়া ভালো পাঠ গায়। উনার তিনটা বই কবে দেখব স্যার?

আগামীকাল রাতেই দেখা যেতে পারে। আগামীকাল হচ্ছে শুক্রবার। উইক এন্ডের শুরু। যদিও আমার জন্যে প্রতিদিনই উইক এন্ড। বিশেষ খাবার দাবারের ব্যবস্থা কর। পোলাও আর খাসির মাংসের রেজালা।

সাথে ইলিশ মাছের ভাজি দিব স্যার?

দিতে পারিস। পোলাও আর ইলিশ এক সূতায় গাঁথা মালা।

শুক্রবার সকালে রফিক বাজারের টাকা এবং ডিভিডি প্লেয়ার নিয়ে পালিয়ে গেল। অমিতাভের তিনটা সিডি তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন। সেগুলিও নিয়ে গেল।

সানাউল্লাহ বললেন, ভেরি স্টুপিড বয়। সানাউল্লাহ সুপিডের চেয়ে খারাপ কোনো গালি দিতে পারেন না। রফিককে স্টুপিড় গালি দিয়েও তার একটু মন খারাপ হলো। কারণ রফিককে তিনি পছন্দ করতেন। পছন্দের মানুষকে গালাগালি করা ঠিক না। রফিক একটা খারাপ কাজ করেছে বলে তিনিও করবেন তা কেমন করে হয়?

সানাউল্লাহ ভালো ঝামেলায় পড়লেন। রাতে তাজ রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেন। অতিরিক্ত মসলা এবং ঝাল দেয়া খাবার। মোটেও ভালো লাগল না।

বাসায় ফিরে তিন চামচ চিনি খেলেন, তাতেও মুখের ঝাল দূর হলো না। তিনি ফ্যান ছেড়ে হা করে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যদি ফ্যানের বাতাসে ঝাল ভাব কিছু কমে। এই সময় এক কান্ড হলো। তার খাটের নিচে খচমচ শব্দ হতে লাগল। তিনি নিচু হয়ে তাকালেন। অবাক হয়ে দেখলেন, ছয় সাত বছরের একটা বাচ্চা চুপচাপ বসে আছে।

মায়াকাড়া চেহারা। বড় বড় চোখ। দীর্ঘ আঁখি পল্লব। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রঙ স্ফটিকের মতো সাদা।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, তুই কেরে?

ছেলেটা ফিস ফিস করে বলল, আস্তে কথা বলুন। ঘুম ভেঙে যাবে তো।

কার ঘুম ভাঙবে?

আমার বোনের। ওর নাম ডমরু।

তিনি খাটের নিচে ছেলেটি ছাড়া কাউকে দেখলেন না। অবাক হয়ে বললেন, ডুমরু কই?

ছেলেটি বলল, ও ভূত তো, এইজন্যে ওকে দেখছেন না।

তুই কী?

আমিও ভূত। আমার নাম হম। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কারণ আমি বড়। মানুষের বেশ ধরতে শিখেছি। ও এখনো শিখে নি। আপনার ঘরে কি মধু আছে?

মধু কী করবি?

খাব।

মধু তো নাই। চিনি দেব? চিনি খাবি?

এক চামচ দিন।

তোর বোনটা কী করছে?

ও ঘুমাচ্ছে। জ্বর এসেছে তো, এইজন্যে ঘুমাচ্ছে।

সানাউল্লাহ বললেন, ভূতদের জ্বর হয়?

হমডু বলল, জ্বর হয়, সর্দিকাশি হয়। যান এক চামচ চিনি নিয়ে আসুন, ক্ষিধে লেগেছে।

সানাউল্লাহ রান্নাঘরের তাকে চিনি খুঁজতে গিয়ে থমকে গেলেন। তিনি এইসব কী করছেন? ভূত আসবে কোত্থেকে? কারোর বাচ্চাছেলে রাগ করে বাসা থেকে পালিয়ে তার ঘরের খাটের নিচে বসে আছে। এই সহজ জিনিসটা না বুঝে তিনি ভূত বিশ্বাস করে বসে আছেন। তিনি পরপর দুবার বললেন, সানাউল্লাহ, তুমি স্টুপিড। তুমি হচ্ছ, এ ভেরি স্টুপিড ম্যান।

তারপরেও তিনি রান্নাঘর থেকে বড় তরকারির চামচভর্তি চিনি নিয়ে ফিরলেন। মানুষের বাচ্চা হোক, ভূতের বাচ্চা হোক, খেতে চেয়েছে খাক।

সানাউল্লাহ চিনি নিয়ে শোবার ঘরে এসে দেখেন খাটের নিচে কেউ নেই। তাহলে একটু আগে যা দেখেছেন সবই ভুল। সানাউল্লাহ এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকলেন, এই এই।

সঙ্গে সঙ্গে খাটের নিচে ছেলেটাকে দেখা গেল। সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরু হয়ে 51

কই ছিলি?

এখানেই ছিলাম। মানুষের বেশ ধরে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না।

সানাউল্লাহ বললেন, নে চিনি খা।

বাচ্চাটা চিনির চামচ নিয়ে খাচ্ছে। চিনির কিছু দানা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। সেগুলিও সে তুলে মুখে দিল।

সানাউল্লাহ বললেন, বোনটাকে দে।

ও চিনি খেতে পারে না, শুধু মধু খায়।

সানাউল্লাহ বললেন, সারারাত না খেয়ে থাকবে?

অসুবিধা নাই।

সানাউল্লাহ বললেন, অসুবিধা নাই মানে? ফাজিল ছেলে। ছোটবোন না খেয়ে থাকবে! নিজে তো গবগ করে চিনি খাচ্ছিস। লজ্জা নাই।

এখন করব কী বলুন? সানাউল্লাহ প্যান্ট খুঁজতে লাগলেন। দোকানে যাবেন। মধু পাওয়া যায় কিদেখবেন। এত রাতে দোকান খোলা থাকার কথা না। তারপরেও চেষ্টা তো নিতে হবে। সানাউল্লাহ বললেন, তোর নাম কী যেন বললি, হমডু না?

হমডু।

তোরা এখানে এসেছিস কীভাবে?

মা রেখে গেছে।

সানাউল্লাহ বললেন, তোর মা গেছে কই?

বাবার খোঁজে গেছে। বাবা রাগ করে দেশান্তরী হয়েছে। মা গেছে তাকে খুঁজে আনতে। মা আমাদের বলেছে, তোরা ঐ বাড়িতে থাক। উনি লোক ভালো।

আমার কথা বলল?

হুঁ।

আমাকে চিনল কীভাবে?

আমরা তো আপনার বাসার সামনের কাঁঠাল গাছে থাকতাম। মনে নাই। একদিন পা পিছলে কাঁঠাল গাছের সামনে ধুম করে পড়ে গেলেন। পা কেটে গেল। ঐদিন বাবা আপনাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছিল। আমার বাবা একটু দুষ্টু আছে।

তোর বাবা-মার ঝগড়া কী নিয়ে?

বাবা দুষ্টু যে এই নিয়ে ঝগড়া। মা বলতো, যার আশ্রয়ে থাক তাকে যখন তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও এটা কেমন কথা!

শেষে বাবা রাগ করে বলল, যা দেশান্তরী হব।

তোরা অপেক্ষা কর। দেখি মধু পাই কি-না। এত রাতে দোকান তো সব বন্ধ।

হম বলল, ওষুধের দোকান সারারাত খোলা থাকে। ওষুধের দোকানে মধু পাবেন।

সানাউল্লাহ ভূত ছেলের বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলেন। ওষুধের দোকানে মধু পাওয়া যায় এটা তার মাথাতেই আসে নি।

তিনি মধু কিনলেন। বাসায় ফিরে মধুর কৌটা খাটের নিচে রেখে চিন্তিত হয়েই ঘুমুতে গেলেন। খাটের নিচে কাউকে দেখা গেল না। সানাউল্লাহ নিশ্চিত, একটু আগে যা দেখেছেন সবই চোখের ভুল। একটা বয়সের পর মানুষ ভুলভাল দেখা শুরু করে। মনে হয় তার সেই বয়স হয়েছে। তিনি কান খাড়া করলেন। খাটের নিচে চকচক শব্দ হচ্ছে। চেটে মধু খাবার শব্দ। তাঁর নিজের খাটের নিচে দুটা ভূতের বাচ্চা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, আবার মধু খাবার চকচক শব্দও অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

সানাউল্লাহর ঘুম যখন আসি আসি করছে তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর মেয়ে জাবিন টেলিফোন করল।

বাবা! কয়েকবার তোমাকে টেলিফোন করেছি, তুমি টেলিফোন ধরো নি।

সানাউল্লাহ বললেন, মধু কিনতে গিয়েছিলামরে মা। ভুলে মোবাইল ফেলে গিয়েছিলাম।

তোমার ডায়াবেটিস, তুমি মধু কিনবে কেন?

নিজের জন্যে না-রে মা। ডমরুর জন্যে। সে মধু ছাড়া কিছুই খায় না।

ডমরু কে?

ডমরু হলো হমডুর ছোটবোন।

এরা কারা?

সানাউল্লাহ বললেন, এদের আলাপটা আজকে থাকুক। আরেকদিন করি।

জাবিন বলল, আরেকদিন করতে হবে কেন? আজই কর। এরা কে?

হমডু ডমরুর মা কয়েকদিনের জন্যে আমার এখানে এদের রেখে গেছে। পরে নিয়ে যাবে।

বিড়ালের বাচ্চা?

প্রায় সেরকমই।

প্রায় সেরকম বলছ কেন? ঠিক করে বলো তো।

সানাউল্লাহ অস্বস্তির সঙ্গে আমতা আমতা করতে করতে বললেন, ভুতের বাচ্চা।

ভূতের বাচ্চা?

হুঁ।

তুমি ভূতের বাচ্চার জন্যে মধু কিনতে গিয়েছিলে?

হুঁ। মা রাখি, পরে কথা হবে।

না, টেলিফোন রাখবে না। এখনই শুনব। ভূতের বাচ্চা দুটা এই মুহূর্তে কোথায়?

আমার খাটের নিচে আছে।

তুমি ওদের দেখতে পাচ্ছ?

ভাইটাকে দেখতে পাই। বোনটা ছোট, দেখতে পাচ্ছি না। বেচারীর আবার জ্বরও এসেছে।

জাবিন থমথমে গলায় বলল, তুমি কি আজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?

না।

শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খাবার কথা না?

হ্যাঁ।

অজি দুটা ট্যাবলেট খেয়ে আরাম করে ঘুমাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ডাক্তারের কাছে যাবে। থরো চেকআপ করবে। তোমার ঘরে ভূতের বাচ্চা, এই কথাও অবশ্যি ডাক্তারকে জানাবে। মনে থাকবে বাবা?

হ্যাঁ মনে থাকবে।

আমি কাল রাতে আবার টেলিফোন করব। বৰা, গুড নাইট।

গুড নাইট মা।

সানাউল্লাহ মেয়ের কথা মতো দুটা ঘুমের ট্যাবলেট (হিপনল, দশ মিলিগ্রাম) খেলেন। একগ্লাস পানি খেলেন। ঘুমের ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় যেতে নেই। পনেরো বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। তিনি ফ্রিজ থেকে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে বিছানায় বসলেন। চুকচুক করে পানি খাবেন। ঝিমুনি আসার জন্যে অপেক্ষা করবেন। এই ফাঁকে মড়ুর সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করা যায়। তবে হড়ু মরুর বিষয়টা পুরোপুরি তার মাথার কল্পনাও হতে পারে। তার আপন ফুপা ফজলু চোখের সামনে কালো রঙের একটা কুকুর দেখতেন। কুকুরটী অন্ধ। তার লেজটা না-কি কাটা। কুকুর দেখামাত্র তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়তেন। বিকট চিৎকার করতেন, আসছে! আবার আসছে! আমার হাতে একটা লাঠি দে।

তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুও হয় কুকুরের ভয়ে। কুকুরটা নাকি তার গলা কামড়ে ধরেছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ছাড়াতে পারেন নি। গোঁ গোঁ করতে করতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু।

সানাউল্লাহ পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ডাকলেন, হমড়ু!

হমড়ু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, হুঁ।

সানাউল্লাহ বললেন, হুঁ কিরে ব্যাটা? বল জি। ভূতের বাচ্চা বলে আদবকায়দা জানবি না? তোর বোনের জ্বর কমেছে?

না। জ্বর আছে।

মধু খেয়েছে?

হুঁ।

ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে জ্বর আবার আসতে পারে। একটা চাদর দেই। চাদরে ঘুমাও।

না।

তোদের ঘুমের ব্যাপারটা কী রকম? তোরাও কি আমাদের মতো রাতে ঘুমাস?

আমরা দিনে ঘুমাই। রাতে জেগে থাকি।

মানুষরা যেমন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখে তোরা দেখিস?

হঠাৎ হঠাৎ দেখি।

কী রকম স্বপ্ন? ভয়ের না আনন্দের?

ভয়ের।

সানাউল্লাহ বললেন, মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে বদহজম থেকে। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম হলেই দুঃস্বপ্ন। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন— আবু করিম। উনি বলেছেন। বড় ডাক্তার। কাল যাব তার কাছে। দেখি তোর বোনের জ্বরের জন্যে কোনো ওষুধ আনা যায় কি-না।

হমডু বলল, কে টেলিফোন করেছিল?

সানাউল্লাহ বললেন, আমার মেয়ে জাবিন।

আপনার একটাই মেয়ে?

হুঁ। অস্ট্রেলিয়ায় থাকে।

অনেক দূর?

হুঁ। মেয়ে ডাক্তারি করে, আর মেয়ের জামাই একটা ইনজিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করে।

হমডু বলল, ওদের ছেলেমেয়ে নেই?

সানাউল্লাহ বললেন, জাবিন পড়াশোনা করছে তো এইজন্যে বাচ্চা নিচ্ছে না। পড়াশোনা শেষ করেই বাচ্চা নিবে। তখন আমিও চলে যাব। শেষ বয়সে নাতীনাতনীর সঙ্গে থাকা খুবই আনন্দের। জাবিন চেষ্টা করছে আমার যেন ইমিগ্রেশন হয়। কাগজপত্র জমা দিয়েছে।

হমডু বলল, ইমিগ্রেশন কী?

সানাউল্লাহ বললেন, অন্যদেশে থাকার অনুমতি। তোদের তো এই সমস্যা নেই। যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারিস, তাই না?

হমডু বলল, হুঁ।

সানাউল্লাহ ধমক দিয়ে বললেন, হুঁ কী? বল, জি।

হমডু বলল, জি।

সানাউল্লাহর ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করেছে। তিনি পানির গ্লাস শেষ করে বালিশে মাথা ছোঁয়াতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। খাটের নিচে চুকচুক শব্দ হচ্ছে। শব্দটাও শুনতে ভালো লাগছে।

# ২. ডা. আবু করিম

ডা. আবু করিম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের প্রাক্তন শিক্ষক। ছাত্রজীবনে তিনি গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। চিকিৎসক কিংবা অধ্যাপক কোনোটাতেই তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর অনেক ছাত্র তাকে ডিঙিয়ে ফুল প্রফেসর হয়েছে। তিনি হতে পারেন নি। প্রাইভেট প্রাকটিস করতে গিয়েছেন, সেখানেও কিছু হয় নি। ডাক্তারদের চেম্বার থাকে রোগীতে ভর্তি। কয়েকজন অ্যাসিসটেন্ট রোগী সামলাতে হিমশিম খায়। তাঁর চেম্বার খালি। মাছিও উড়ে না। কারণ তার চেম্বার অতি পরিচ্ছন্ন চেম্বার। মাছিরা পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে না।

ভালো বেতন দিয়ে তিনি একজন অ্যাসিসটেন্ট রেখেছিলেন। নাম্বার দেয়া প্লাস্টিকের কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। ওয়েটিং রুমে ৪২ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি রেখেছিলেন। রোগীর নাম্বার ফ্ল্যাট স্ক্রিনে উঠবে তখন রোগী ঢুকবে। তার আগে না। প্লাস্টিক নাম্বার কার্ডে তিনি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু নির্দেশও লিখেছিলেন। নমুনা—

রোগী নাম্বার ১৪

ক) TV screen-এ নাম্বার না দেখা পর্যন্ত শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন।

খ) আপনার রোগ নিয়ে পাশের রোগীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা থেকে বিরত থাকুন।

গ) পেছনের নাম্বার আগে আনার তদবির করবেন না।

ঘ) মোবাইল টেলিফোনে উচ্চস্বরে আলাপ করবেন না।

ঙ) আপনাদের সময় কাটানোর জন্যে অনেক ম্যাগাজিন রাখা আছে। ম্যাগাজিন পড়ুন। তবে দয়া করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন না।

আবু করিমের অ্যাসিসটেন্ট তিন মাস কাজ করার পর অর্থাৎ তিন মাস চুপচাপ বসে থাকার পর এক সন্ধ্যায় চারটা থার্মোমিটার, প্রেসার মাপার যন্ত্র, কান দেখার যন্ত্র এবং পাঁচটা ওরস্যালাইনের প্যাকেট নিয়ে ভেগে চলে গেল। ডা. আবু করিম চেম্বার উঠিয়ে দিলেন।

এখন তিনি একা থাকেন। তার স্ত্রী (তিনিও ডাক্তারী শায়লা আলাদা থাকেন। তিনি বলেন, অর্ধ উন্মাদের সঙ্গে বাস করা সম্ভব না। ডাক্তার হিসেবে শায়লা অত্যন্ত সফল। তার চেম্বার সব সময় রোগীতে ভর্তি থাকে।

ডা. আবু করিমের এখন সময় কাটে টিভিতে রান্নার অনুষ্ঠান দেখে দেখে বিভিন্ন খাবার তৈরিতে। তিনি আচার বানানোতেও বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেছেন। তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন নিম পাতার তিক্ত আচার। জাতীয় আচার প্রতিযোগিতায় তাঁর তৈরি নিম পাতার তিক্ত আচার পঞ্চম পুরস্কার পেয়েছে। সাজিনা গাছের ছালের আচার পেয়েছে অনারেবল মেনশান। বাণিজ্যিকভাবে তিনি এই দুই ধরনের আচার তৈরির বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন।

ডা. আবু করিমের একমাত্র বন্ধু সানাউল্লাহ। আবু করিম রোগী দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সানাউল্লাহর ব্যাপারে অন্য কথা। সানাউল্লাহ শুধু যে তার রোগী তা-না, আচার টেস্টার। বন্ধুর আচার প্রতিভায় সানাউল্লাহ মুগ্ধ।

সকাল দশটার আগে কাউকে দেখতেই আবু করিম খুশি হন না। আজ সানাউল্লাহকে দেখে অতিব আনন্দ পেলেন। গত সাতদিনের চেষ্টায় নতুন একটি আচার তৈরি হয়েছে। আমার জগতের বিপ্লব বলা যেতে পারে। কারণ এই আচারের নাম আমিষ আচার। গরুর মাংসের নির্যাসের সঙ্গে কাচামরিচ, শুকনা মরিচ এবং নাগা মরিচের নির্যাস প্রথমে মেশানো হয়েছে। টকভাব আনার জন্যে দেয়া হয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড। জেলিভাব আনার জন্যে তার সঙ্গে মিশানো হয়েছে Agar Agar, প্রতিটি আচারের বোতলে একটি করে বিশ মিলিগ্রামের ভিটামিন B কমপ্লেক্স মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। পুষ্টিমান ঠিক রাখার ব্যবস্থা।

সানাউল্লাহ চায়ের চামচে এক চামচ আমিষ আচার খেয়ে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে বললেন, জিনিসটা মনে হচ্ছে বিষাক্ত।

আবু করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, বিষাক্ত হবে কোন দুঃখে? তুমি চামচ ভর্তি করে সিরাপের মতো করে খাচ্ছ বলে এরকম লাগছে। চেটে চেটে খাও।

সানাউল্লাহ তাই করলেন এবং বললেন, মন্দ না।

আবু করিম বললেন, মন্দ না শব্দটা আমার সামনে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবে। মন্দ না হচ্ছে একটা নন কমিটেল টার্ম। লাইফে কমিট করতে হয়। বলবে মন্দ অথবা ভালো। মন্দ না কখনোই না।

সানাউল্লাহ বললেন, ভালো, তবে একটু ইয়ে।

ইয়ে মানে? স্পষ্ট করে বলো।

স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। আরেক চামচ খেয়ে দেখি।

যত ইচ্ছা খাও। অতি উপকারী আচার। প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক অ্যামিনো অ্যাসিডে ভর্তি। এর সঙ্গে হয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। আগার আগার দেয়াতে কোষ্ঠকাঠিন্যও কাজ করবে। নাগা মরিচ এবং কাচামরিচের রস ব্লাড থিনারের কাজ করবে, থ্রম্বোসিস হবে না।

সানাউল্লাহ মুগ্ধ হয়ে বললেন, দেখি আরেক চামচ। তিনি দুপুরের মধ্যে বোতল অর্ধেক নামিয়ে ফেললেন।

আবু করিম বললেন, আজ আমার মনটা বিশেষ খারাপ। তোমার আচার খাওয়া দেখে মন খারাপ ভাব সামান্য কমেছে।

মন খারাপ কেন?

আমার চোর অ্যাসিসটেন্টকে তোমার ভাবি তার চেম্বারে চাকরি দিয়েছে।

কাজটা ঠিক হয় নি।

গুন্ডা প্রকৃতির কারো সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

আছে। আমার খালাতো ভাই হামিদুর রহমান ওয়ার্ড কমিশনার।

তাকে দিয়ে আমার চোর অ্যাসিসটেন্টকে পাবলিকলি কানে ধরে উঠবোস করাতে পারবে? তোমার ভাবির সামনে করালে ভালো হয়।

সানাউল্লাহ বললেন, তার ঠিকানা জানি না। দেখি যোগাযোগ করতে পারি কি-না।

আবু করিম আমিষ আচারের সাফল্যে মুগ্ধ হলেন। সানাউল্লাহ বললেন, জাবিন কাল রাতে আমাকে বিশেষভাবে বলেছে থরো চেকআপ করতে।

আবু করিম বললেন, এখনই করছি, প্রেসার-সুগার সব মেপে দিচ্ছি।

সানাউল্লাহ বললেন, জ্বরের একটা ওষুধ দিও তো।

আবু করিম বললেন, তোমার জ্বর?

আমার না। ডমরুর জ্বর।

ডমরু কে?

সানাউল্লাহ বললেন, ডমরু হলো হমডুর ছোটবোন।

বয়স?

ঠিক বয়স বলতে পারব না। শিশু।

আবু করিম বললেন, শিশুদের আমি জ্বরের জন্যে এনালজেসিক দেবার পক্ষপাতি না। গা স্পঞ্জ করে জ্বর কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে কোল্ড শাওয়ার।

সানাউল্লাহ বললেন, তোমার এই আমিষ আচার শিশুরা কি খতে পারবে?

এখনো টেস্ট করা হয় নাই। তবে ঝাল বেশি, এটা একটা সমস্যা। শিশুদের জন্যে আলাদা একটা মিষ্টি ভার্সান করার পরিকল্পনা আছে। বাজারে অনেক কাচামরিচ পাওয়া যায় ঝালের বংশও নাই। তার নির্যাস ব্যবহার করা হবে। সঙ্গে মধু দেয়া হবে। মধুর Fructose শিশুরা পছন্দ করবে। চেটে চেটে খাবে।

সানাউল্লাহ হঠাৎ করে বললেন, তুমি কি ভূত বিশ্বাস কর?

আবু করিম ভুরু কুঁচকে বললেন, ভূতের কথা এল কী জন্যে?

এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।

ভূত-ফুত বিশ্বাস করি না। ভূত হচ্ছে দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষের কল্পনা।

সানাউল্লাহ বললেন, ঠিক বলেছ।

আবু করিম বললেন, ভূত প্রেত প্রসঙ্গ আমার সামনে তুলবে না। অযথা সময় নষ্ট।

সানাউল্লাহ বলল, অবশ্যই।

তুমি আচারের বোতলটা নিয়ে যাও। ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখ কী অবস্থা।

সানাউল্লাহ বন্ধুর কাছ থেকে আমিষ আচারের বোতল নিয়ে বাসায় ফিরলেন। জাবিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন করল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, বাবা, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

ডাক্তার কী বললেন?

বললেন সব ঠিক আছে। ব্লাড় কলোস্টরেল টেস্ট করতে বলেছেন। কাল পরশু করিয়ে ফেলব।

হমড়ু ডমরুর বিষয়টা বলেছ?

বলেছি। ডমরুর জ্বরের কথা বললাম। উনি কোনো ওষুধ দিতে রাজি হন নি। তবে ওদের জন্যে এক বোতল আচার দিয়ে দিয়েছেন।

কী বললে, এক বোতল আচার দিয়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ। আমিষ আচার। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ।

বাবা, তুমি অবশ্যই ঘন ঘন করিম চাচার বাসায় যাবে না। এত বড় একজন ডাক্তার হয়ে যিনি শুধু আচার বানান তার মাথায় সমস্যা আছে।

সানাউল্লাহ হতাশ গলায় বলেন, শুধু আচার তো বা বানায় না। রান্না করেন। নতুন নতুন রেসিপি আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষার তিতা করলা দিয়ে গরুর মাংস অসাধারণ জিনিস। একবার যে এই জিনিস খাবে তার মুখে অন্য কিছু রুচবে না।

জাবিন বলল, করিম চাচাপ্রসঙ্গে কথা বলতে আর ভালো লাগছে না। বাবা শোন, তুমি তোমার ভূতের বাচ্চাকে টেলিফোন দাও। আমি কথা বলব।

এখন তো দেয়া যাবে না।

কেন দেয়া যাবে না? তারা তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমার সঙ্গেও কথা বলতে পারবে।

ওরা ঘুমাচ্ছে। এরা দিনমায় রাতে জেগে থাকে।

বাবা শোন, তোমার কথাবার্তা আমার কাছে খুবই এলোমেলো মনে হচ্ছে। আমি এক মাসের মধ্যে ঢাকায় এসে তোমার ব্যবস্থা করছি।

কাবেই এলোমেলো মনে হচ্ছে আমিএকমাসের মধ্যে ঢাকায় এসে তোমার ব্যবস্থা করছি।

সানাউল্লাহ আনন্দিত গলায় বললেন, মা চলে আয়। অনেকদিন তোকে দেখি না। কবে আসবি তারিখটা বল, আমি এয়ারপোর্টে থাকব।

জাবিন বলল, আমাকে একটা সত্যি কথা বলো তো বাবা। তুমি ঢাকায় আমাকে আনার জন্যে ভূতের গল্প ফেঁদেছ। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই মনে করে আমি ছুটে যেন চলে আসি। ঠিক বলছি না বাবা?

সানাউল্লাহ চুপ করে রইলেন।

জাবিন বলল, দেখছ আমার কত বুদ্ধি। আমাকে আনার জন্যে ভূতের গল্প ফাঁদার প্রয়োজন নেই বাবা। তোমার জামাই ছুটি পাচ্ছে না বলে আসতে পারছি না। ছুটি পেলেই চলে আসব। আমাকে আর ভূত-প্রেতের গল্প বলবে না। বাবা, ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

বাবা, টেলিফোন রাখি?

আচ্ছা।

টেলিফোন রেখে সানাউল্লাহ ঘর তালাবন্ধ করে বের হলেন। কয়েকটা জিনিস কেনা দরকার।

হমডু ডমরুর জন্যে নরম পোশাক। কয়েক কৌটা মধু। বিভিন্ন রকমের ফলের জুসও কেনা যেতে পারে। মধু যেহেতু খায় ফলের রসও খাবার সম্ভাবনা। নিউ মার্কেতে বইয়ের দোকানে যাওয়া দরকার। ভূত বিষয়ে বইপত্র যদি পাওয়া যায়।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ভূত-প্রেত বিষয়ক অনেক বই পাওয়া গেল। সবই গল্প উপন্যাস। যেমন— রাক্ষস খোক্কস। রক্তহিম ভূতের গল্প। বাঁশগাছের পেত্নী। সানাউল্লাহর দরকার শিক্ষামূলক বই, এইসব না। তিনি লাইব্রেরিয়ানকে বললেন, এর বাইরে কিছু

আছে?

লাইব্রেরিয়ান বললেন, এর বাইরে বলতে কী বুঝাচ্ছেন?

শিক্ষামূলক বই। যেমন, ভূতের খাদ্য। বা ভূতদের সামাজিক বিন্যাস। আমার আসলে প্রয়োজন ভূতদের খাদ্য বিষয়ক বই।

লাইব্রেরিয়াম অবাক হয়ে বললেন, ভূতের খাদ্য বিষয়ক বই চাচ্ছেন?

সানাউল্লাহ বললেন, জি। আমরা মানুষরা মূলত তিন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি আমিষ, শর্করা, স্নেহ। ভূতদের কী অবস্থা। আমার বাসায় দুটা ভূতের বাচ্চা আছে। ওদের কী খাওয়া বুঝতে পারছি না। সমস্যায় আছি।

আপনার বাসায় দুটা ভূতের বাচ্চা?

জি। ভাইবোন।

ও আচ্ছা।

ভাইটা বড়! নাম হমডু। ওদের পুষ্টিকর খাবার কী দেয়া যায় তাই নিয়ে চিন্তিত।

লাইব্রেরিয়ান বললেন, স্যার, আপনি বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টি বিজ্ঞানে চলে যান। তারা হয়তো বলতে পারবে।

সানাউল্লাহ বললেন, পুষ্টি বিজ্ঞানে যাবার ইচ্ছা আছে। তবে তারা আমাকে পাগল ভাবে কি-না কে জানে।

পাগল ভাবার সম্ভাবনা আছে। স্যার, চা খাবেন? একটু চা খান। এখানে ভালো সিঙ্গারা পাওয়া যায়। সিঙ্গারা আনিয়ে দেই।

সানাউল্লাহ লাইব্রেরিয়ানের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। চা-সিঙ্গারা খেতে রাজি হলেন। এবং ভদ্রতার কারণেই তার দোকান থেকে একটা বই কিনলেন। ভূতের বই। নাম মধ্যরাতের হাসি! লাইব্রেরিয়ান বললেন, স্যার আমার নাম কাদের। এদিকে যখন আসবেন অবশ্যই আমার দোকানে আসবেন। চা-সিঙ্গারা খেয়ে যাবেন। আপনার বাসায় গিয়ে ভূতের বাচ্চা দেখারও শখ আছে। যদি অনুমতি দেন।

সানাউল্লাহ বললেন, এখন ওদেরকে লুকিয়ে রেখেছি। জানাজানি হলে লোকজন হামলে পড়বে। পত্রিকাওয়ালা, টিভি চ্যানেল। জীবন অস্থির করে ফেলবে।

ঠিক বলেছেন স্যার।

নিউ মার্কেট থেকে সানাউল্লাহ কিছু কেনাকাটা করলেন। হমডুর জন্যে লাল শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট। একজোড়া রাবারের নরম জুতা। ডমরুর জন্যে কিছু কেনা হলো না। তাকে

তিনি এখনো চোখে দেখেন নি, তার সাইজ কী তাও জানেন না। কিছু খেলনা কিনলেন। ব্যাটারিতে চলে এমন গাড়ি। একটা মাছ, বোতাম টিপলেই লেজ নেড়ে এগুতে থাকে, পোঁ পোঁ শব্দ করে। বড় একটা গাঢ় হলুদ রঙের বল কিনলেন। ভূতের বাচ্চারা এইসব খেলনা পছন্দ করে কি-না তিনি জানেন না। তারপরেও কেনা থাকল। শিশু হচ্ছে শিশু। ভূতশিশু মানবশিশু আলাদা কিছু না বলেই তার ধারণা। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে তার এক বন্ধু আছেন। প্রফেসর। নাম ড. আইনুদ্দিন। তার সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

ড. আইনুদ্দিন সিরিয়াস ধরনের মানুষ। যে-কোনো বিষয় নিয়ে সিরিয়াস কথাবার্তা বলতে পছন্দ করেন। ছাত্রমহলে তিনি গাইনুদ্দিন নামে পরিচিত। গাই নামক নিরীহ প্রাণী যেমন সারাদিন জাবর কাটে গাইনুদ্দিনও নাকি তাই করেন। বিজ্ঞানের জাবর কাটেন।

সানাউল্লাহ নিজের বাসায় না ফিরে আইনুদ্দিনের ফুলার রোডের বাসার দিকে রওনা হলেন। দুপুরের খাওয়া তার ওখানেই সারবেন। খেতে খেতে ভূত বিষয়ক আলোচনা করবেন। তাকে বাসায় না পাওয়া গেলেও সমস্যা নেই। আইনুদ্দিনের কাজের ছেলে রহমত তাকে ভালোই চেনে। আইনুদ্দিন এবং তার স্ত্রী রুবার ঝগড়া মিটমাট করার জন্যে তাকে অনেকবার এ বাড়িতে আসতে হয়েছে। তাদের ঝগড়া ধারাবাহিক নাটকের মতো হয়ে যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে দুবার করে হচ্ছে। দুজনের বয়সের বিরাট ব্যবধান একটা কারণ হতে পারে।

আইনুদ্দিন বাসায় ছিলেন। সানাউল্লাহকে দেখে তিনি অতি বিরক্ত গলায় বললেন, তোমার সমস্যা কী? আইনুদ্দিনের এই বাক্য মুদ্রাদোষের মতো। যেকোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করেন, সমস্যা কী?

সানাউল্লাহ বললেন, ভাবি বাসায় নেই?

না।

আবার ঝগড়া?

আইনুদ্দিন বললেন, ঝগড়া টগড়া কিছু না। ইদানিং লক্ষ করছি আমি যা-ই বলি সে বিরক্ত হয়। গতকাল রাতে ঘুমাতে যাবার সময় আমি তাকে বললাম, Photo electric eftect-এর জন্যে আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেয়া তাকে অপমান করার মতোই। রুবাকে বুঝানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনায় গেলাম। তাকে বললাম রবীন্দ্রনাথকে যদি তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে শুধুমাত্র এই কবিতাটার জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হতো তাকে অপমান করা হতো। কথা শেষ করার আগেই তোমার ভাবি বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, বিদায়। আমি বললাম, বিদায় মানে কী? কাকে বিদায় বলছ? আইনস্টাইনকে না বরীন্দ্রনাথকে? তোমার ভাবি কোনো জবাব না দিয়ে পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখি চলে গেছে। টেলিফোন করি টেলিফোন ধরে না। তুমি এসেছ ভালো হয়েছে। তুমি আমার শ্বশুরবাড়িতে যাবে। তোমার ভাবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসবে।

সানাউল্লাহ বললেন, অবশ্যই নিয়ে আসব। দুপুরে তোমার এখানে খাব। রান্নাবান্না কি হয়েছে?

জানি না। রহমতকে জিজ্ঞেস কর। বাজারের টাকা নিতে এসেছিল, ধমক দিয়ে বিদায় করেছি। মনে হয় না সে কিছু বেঁধেছে।

রহমত রান্না করেছে। ভাত ডাল এবং শুকনা মরিচের ভর্তা। খাবার টেবিলে সানাউল্লাহ ভূত বিষয়ক আলাপ তুললেন।

তোমাদের সায়েন্স কী বলে? ভুত বলে কিছু আছে?

আইনুদ্দিন বললেন, সায়েন্স এই বিষয়ে কিছু বলে না। সায়েন্স হচ্ছে পরীক্ষা নির্ভর শাস্ত্র। ভূত বিষয়ে কোনো পরীক্ষা হয় নি।

হয় নি কেন?

প্রয়োজন হয় নি বলে পরীক্ষা হয় নি।

সানাউল্লাহ বললেন, তোমার কি মনে হয়? ভূতের অস্তিত্বের কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

আইনুদ্দিন বললেন, এই বিষয়ে চিন্তা করি নি।

সানাউল্লাহ বললেন, ছোটবেলায় শুনেছি রাতে মিষ্টির দোকানে জিনরা উপস্থিত হয়। সব মিষ্টি খেয়ে শেষ করে। এটা কি সম্ভব?

আইনুদ্দিন বললেন, কোনো প্রাণী যদি খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই তাকে খাদ্যের বর্জ বের করে দিতে হবে। জিন মিষ্টি খেলে তাকে হাগু করতে হবে। কেউ কখনো জিনের গু দেখেছে? যেহেতু দেখে নাই সেহেতু জিন মিষ্টি খায় না। একে বলে ডিডাকটিভ লজিক।

সানাউল্লাহ বললেন, তোমার কথায় যুক্তি আছে। যাই হোক, তুমি কি ভূতপ্রেত বিষয়ক কিছু তথ্য আমাকে যোগাড় করে দিতে পারবে?

কী করবে?

সানাউল্লাহ বললেন, রিটায়ারমেন্টে চলে গেছি। কাজকর্ম নাই তো, সময় কাটানো।

সায়েন্সের কিছু সহজ বই দিয়ে দেই। পড়ে সময় কাটাও। ক্যালকুলাসের ইতিহাস বইটা দেব? ক্ষুদ্র সংখ্যার বিজ্ঞান। অসাধারণ জিনিস।

সানাউল্লাহ অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, দাও। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। গুন্ডা প্রকৃতির কোনো ছাত্র কি তোমার আছে? মারামারিতে বিশেষ পারদর্শী এরকম কেউ?

কেন?

একজনকে সবার সামনে চড়-থাপ্পর দেয়া প্রয়োজন।

আইনুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, তোমার কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনব কল্পনাও করি নি। আমি আমার ছাত্র ব্যবহার করব গুন্ডামির জন্যে? আমি কি পলিটিক্যাল লিডার। সরি বলো।

সানাউল্লাহ বললেন, সরি।

আইনুদ্দিন তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ঘেঁটে ক্যালকুলাসের ইতিহাস বইটা বের করলেন।

সানাউল্লাহ ক্যালকুলাসের ইতিহাস বই নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। আইনুদ্দিনের স্ত্রীকে আনার জন্যে তার যাবার কথা ছিল। আইনুদ্দিন কিছুতেই শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার মনে করতে পারলেন না। কাজেই স্ত্রী ফেরত আনার প্রজেক্ট বাতিল হয়ে গেল।

# ৩. খাটের নিচে হমডু বসা

খাটের নিচে হমডু বসা। তার হাতে আমিষ আচারের কৌটা। সে কৌটায় চামচ ডুবিয়ে দ্রুত খাচ্ছে। খাবার দৃশ্যটা দেখছেন সানাউল্লাহ। তিনি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসেছেন।

হমডু! তোর খবর কী?

ভালো।

তোর বোনের খবর কী? ডমরু। তার জ্বর কমেছে?

হুঁ।

আচারটা খেতে কেমন?

ভালো।

এর নাম আমিষ আচার। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ। পুরো বোতল একা খেয়ে ফেলেছিস! পেট নেমে যাবে তো। হেগে বাড়ি নষ্ট করবি।

হমডু জবাব দিল না। হেগে বাড়ি নষ্টের ব্যাপারটা মনে হয় সে বুঝতে পারে নি। হয়তো ওদের মধ্যে ঐ সিস্টেমই নেই।

তোর জন্যে শার্ট প্যান্ট এনেছি, দেখেছিস?



www.bengaliebook.com

হুঁ।

তোর বোনের সাইজ জানি না। তাপরেও একটা ফ্রক অনলাম। ফিটিং হবে কি-না কে জানে।

হমডু বলল, হবে।

দুই ভাইবোন মিলে জামা কাপড় পর। দেখি কী অবস্থা।

হমডু বলল, জুতা আনেন নাই?

সানাউল্লাহ বললেন, তোর জন্যে রবারের জুতা এনেছি। ডমরুর পায়ের মাপ জানি না তারটা আনা হয় নি। পায়ের মাপ দিয়ে দিস নিয়ে আসব। তোরা এখন খাটের নিচ থেকে বের হ। আমি তোষক পেতে দেই। তোষকে আরাম করে ঘুমাবি। শিমুল তুলার তোষক। মাখনের মতো মোলায়েম।

সানাউল্লাহ তোষক পাতলেন। তোষকের ওপর চাদর বিছালেন। দুটা ছোট বালিশ এবং একটা কোলবালিশ কিনেছিলেন, সেগুলি সাজাতে সাজাতে বললেন, তোদের কি পানি খাবার অভ্যাস আছে? পানির গ্লাস জগ রাখব?

হমডু বলল, না। মধু রেখে দিন।

খেলনা কিনেছি। খেলনা দিয়ে খেলবি?

খেলব।

ব্যাটারি অপারেটেড খেলনা। বোতাম টিপবি খেলনা চলবে! বোতাম টিপতে পারিস?

না।

এই তো আরেক যন্ত্রণা। ঠিক আছে, সব সমস্যার সমাধান আমার কাছে আছে। যখন খেলতে ইচ্ছা করবে আমাকে বলবি আমি বোতাম টিপে দেব। চলবে না।

চলবে।

প্রথম কোনটা দিয়ে খেলতে চাস? মাছটা ছাড়ব? বোতাম টিপলেই মাছ লেজ নাড়তে নাড়তে তোর দিকে যাবে। ছাড়ব?

আচ্ছা।

বোতাম টিপে মাছ ছাড়তেই এক কাণ্ড হলো। হমডু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ডমরুও চেঁচাতে লাগল। সানাউল্লাহ প্রথমবারের মতো ডমরুর গলা শুনলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মাছ আটকালেন? ভূতের বাচ্চারা যে সামান্য মাছ দেখে এতটা ভয় পাবে তিনি ভাবেন নি। ভাইবোন দুজনই কাঁদছে। ভাইটাকে দেখা যাচ্ছে। বোনকে দেখা যাচ্ছে না। তার কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সানাউল্লাহ বললেন, ভয় নাই। আর ভয় নাই। এই দেখ ব্যাটারি খুলে ফেললাম। এখন খুশি?

হমডু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে চোখ মুছল। সে ব্যাটারি ছুঁয়ে দেখল। সানাউল্লাহ বললেন, এই দুটা হলো ব্যাটারি। এখান থেকে কারেন্ট তৈরি হয়। কারেন্ট খেলনা চলে। তুই একটা হাতে নে। বোনের হাতে একটা দে। ভয় কাটুক।

কলিংবেল বাজছে। সানাউল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বাসায় কেউ আসে না। কে এসেছে বুঝতে পারছেন না। রাত আটটা বাজে তাঁকে হোটেলে খেতে যেতে হবে।

দরজা খুলে তিনি হতভম্ব। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ইলিশ মাছ। রফিককে কী বলবেন বুঝতে পারছে না। কঠিন ধমক দেয়া উচিত। চুরি করে ভেগেছে এখন ইলিশ মাছ নিয়ে উপস্থিত। বদের বাচ্চা। সানাউল্লাহ ধমক দেবার প্রস্তুতি নিলেন। কয়েকবার খাকাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। যখন ধমক দিতে যাবেন তখন রফিক বলল, স্যার কেমন আছেন?

তিনি বললেন, ভালো।

রাতে খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

না।

খান কই? হোটেলে?

হুঁ।

ইলিশ মাছ নিয়া আসছি। বেগুন দিয়ে বাঁধি। স্যার, ঘরে কি বেগুন আছে? জানি না। খুঁজে দেখ।

রফিক রান্নাঘরে ঢুকে গেল। সানাউল্লাহ ধমক জমা করে রাখলেন। সুবিধামতো সময়ে ধমক দিলেই হবে। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। রাতে তাকে আজ হোটেলে খেতে যেতে হবে না। এই আনন্দেই তিনি অস্থির। আনন্দের সময় ধমক আসতে চায় না। তবে এর মধ্যে রফিক যদি নিজ থেকে ক্ষমা চেয়ে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা। ক্ষমা চাওয়ার পরে অপরাধ থাকে না। তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন।

রফিক বিপুল উৎসাহে কাজে লেগে পড়েছে। এখন মাছ কুটছে। রফিক বলল, বেগুন ঘরে নাই স্যার। আলু আছে। আলু দিয়া ঝোল করি, আর এক পিস ভাইজা দেই। ঠিক আছে স্যার?

হুঁ।

এখন কি এককাপ চা বানায়া দিব?

দে। আচ্ছা শোন, তুই ভূত বিশ্বাস করিস?

রফিক বলল, ভূত অবশ্যই বিশ্বাস করি। আমি তো বেকুব না যে ভূত বিশ্বাস করব না।

ভূত কখনো দেখেছিস?

আমার বাপজান দেখেছেন। আমরার বাড়ির সামনে একটা তেঁতুল গাছ ছিল। সেই তেঁতুল গাছে পেততুনি থাকত। হের স্বভাব চরিত্র ছিল জঘন্য।

কী করত?

মাইনষের গায়ে ছেপ দিয়া হি হি কইরা হাসত। কাপড়চোপরও ঠিকমতো পরত না। বাপজান অনেক দিন দেখেছে গাছে লেংটা বসা।

পরে তোর বাপজান কি করলেন?

তেঁতুল গাছ কাটায়া ফেললেন। পেততুনি বিদায়।

সানাউল্লাহ বললেন, গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল?

রফিক বলল, সাথে সাথে যায় নাই। কিছুদিন বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। ঢিল মারছে। তারপর চইল্যা গেছে।

কোথায় গেছে জানিস না?

অন্য কোনো তেঁতুল গাছে গিয়া উঠছে। পেততুনি তেঁতুল গাছ ছাড়া থাকতে পারে না।

সানাউল্লাহ বললেন, ভূতের খাদ্য কী জানিস নাকি?

রফিক বলল, জানি। গজার মাছ পুড়ায়া দিলে আরাম কইরা খায়। কাচা মাছও খায়, তয় টাটকা হইতে হয়। বিলের আশেপাশে এরা মাছের সন্ধানে ঘুরে। স্যার ঘরে গিয়া বসেন চা বানায়া আনতেছি।

শোবার ঘরে ঢুকতেই হমডু বলল, ব্যাটারি খাব।

সানাউল্লাহ অবাক হয়ে দেখেন এরা ব্যাটারি দুটাই খেয়ে ফেলেছে। কার্বনটা পড়ে আছে।

তোরা ব্যাটারি খেয়েছিস?

হুঁ। খুব মজা।

বলিস কী। ভূত ব্যাটারি খায় এটা তো জানতাম না।

হমডুর পাশ থেকে চিকন গলায় ডমরু বলল, বাবা। ব্যাটারি খাব।

সানাউল্লাহ চমকে উঠে বললেন, এই মেয়ে আমাকে বাবা ডাকছে না-কি?

হমদু বলল, হুঁ।

সানাউল্লাহ বললেন, বাবা ডাকছে কেন?

হমডু বলল, জানি না।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সানাউল্লাহ বললেন, বাবা ডাকার দরকার নাই। স্যার ডাকলেই হবে।

ডমরু বলল, আমি বাবা ডাকব। বাবা ডাকব। বাবা ডাকব।

সানাউল্লাহ হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে। বাবা ডাকতে চাইলে ডাক অসুবিধা কিছু নাই। ব্যাটারি খেতে চাস কাল কিনে আনব। ব্যাটারি খাওয়া ঠিক হচ্ছে কি-না তাও তো বুঝছি না।

রফিক চা নিয়ে এসেছে। হমডু ফুরুৎ করে খাটের নিচে ঢুকে গেছে। সানাউল্লাহ ঠিক করতে পারলেন না রফিকের সঙ্গে ভূতের বাচ্চা দুটার ব্যাপারে আলাপ করবেন কি না। এক বাড়িতে যেহেতু বাস আলাপ করাই উচিত। তবে তাড়াহুড়ার কিছু নাই। রফিক নিজ থেকে আবিষ্কার করুক সেটাই ভালো হবে।

জাবিনের টেলিফোন এসেছে। জাবিন আদুরে গলায় ডাকল— বাবা!

সানাউল্লাহ বিস্মিত গলায় বললেন, তোর বাবা ডাক আর ডমরুর বাবা ডাক একই রকম। তোদের দুজনের গলায় অদ্ভুত মিল।

জাবিন বলল, ডমরু কে?

সানাউল্লাহ আমতা আমতা করতে লাগলেন। জাবিন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তোমার ঐ ভূতের বাচ্চাটা না-কি?

সানাউল্লাহ বললেন, ঠাট্টা করছি রে মা। ঠাট্টা। মনটা ভালো তো এই জন্যেই ঠাট্রা তামাশা।

মন ভালো কেন?

রফিক চলে এসেছে। কাজকর্ম শুরু করেছে। আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রান্না করেছে। ইলিশ মাছ সে নিজেই কিনে এনেছে। মিডিয়াম সাইজ।

জাবিন কড়া গলায় বলল, চোরটা ফিরে এসেছে আর তুমি তাকে বহাল করেছ? আবার তো চুরি করবে। এক্ষুনি বিদায় কর। এই মুহূর্তে।

সানাউল্লাহ বললেন, অবশ্যই বিদায় করব। চোর পুষব না-কি? আমি চোর পোষার লোক না।

জাবিন বলল, আমি টেলিফোন ধরে আছি। তুমি ওকে ডাক। বিদায় কর। আমি যেন শুনতে পাই।

এখন তো মা ডাকা যাবে না। তাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠিয়েছি। ব্যাটারি কিনতে পাঠিয়েছি। সানাউল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না তবে মেয়ের সঙ্গে হড়বড় করে মিথ্যা বলছেন। তাঁর নিজেরই অবাক লাগছে।

ব্যাটারি কিনতে পাঠিয়েছ?

হুঁ। দুটা ব্যাটারি ছিল ওরা খেয়ে ফেলেছে।

কারা খেয়ে ফেলেছে। ঠিক করে বলো বাবা। ব্যাটারি কে খেয়েছে? তোমার ঐ ডমরু?

আরে না। ডমরুর কোনো অস্তিত্ব আছে না-কি যে ব্যাটারি খাবে।

তাহলে কে খেয়েছে?

আমিই খেয়েছি। টেস্ট করে দেখলাম।

তুমি ব্যাটারি খেয়েই মানে! তুমি কেন ব্যাটারি খাবে?

সানাউল্লাহ হতাশ গলায় বললেন, ঠাট্টা করছি রে মা। ঠাট্টা। প্লেন এন্ড সিম্পল ঠাট্টা। বিদেশে দীর্ঘদিন থেকে তুই ঠাট্টা তামাশা ভুলে গেছিস এটা দুঃখজনক।

জাবিন বলল, তুমি ঠাট্টা করছ এমন মনে হচ্ছে না। ব্যাটারি নিয়ে কিছু একটা অবশ্যই ঘটেছে। সেটা কী আমি জানতে চাই।

সানাউল্লাহ আয়োজন করে মিথ্যা বলা শুরু করলেন— হয়েছে কি মী। আমি একটা মাছের খেলনা কিনেছি। বোতাম টিপলে মাছটা লেজ নাড়তে নাড়তে আগায়। কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে আবার ফিরে আসে। পোঁ পোঁ শব্দ করে। ঐ খেলনার জন্যে ব্যাটারি কিনতে পাঠিয়েছি।

খেলনা কার জন্যে কিনেছ?

আমার জন্যে।

তুমি মাছের খেলনা দিয়ে খেলবে?

হুঁ মানে? তুমি মাছের খেলনা দিয়ে খেলো?

সানাউল্লাহ বললেন, সব সময় তো খেলি না। ঘুমুতে যাবার আগে কিছুক্ষণ খেলি।

জাবিন বলল, ঠিক আছে বাবা। পরে তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে ডিটেল কথা হবে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে তুমি ঘুমাও। সকালে হামিদ আঙ্কেল যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে সেই ব্যবস্থা করছি।

সানাউল্লাহ বললেন, খামাখা উনাকে যন্ত্রণা দেবার আমি তো কোনো প্রয়োজন দেখি না।

তুমি প্রয়োজন দেখ না, আমি দেখি। সামথিং ইজ ভেরি রং উইথ ইউ।

অনেক দিন পর রাতে তিনি আরাম করে খাওয়াদাওয়া করে বিছানায় ঘুমুতে গেলেন। রফিক পায়ে লোসন ঘসে দিচ্ছে। আরামে তাঁর শরীর ঝিম ঝিম করছে। ঘুমিয়ে পড়লে আরামটা পাওয়া যাবে না বলে তিনি কষ্ট করে জেগে আছেন। তাঁর হাতে মধ্যরাতের হাসি নামের বই। কাহিনী অত্যন্ত জমাট। শহরতলির এক হোটেলে কুদ্দুস নামের একজন ক্যানভাসার রাত কাটাতে গেছে। সে যতবার বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যায় ততবার আপনাআপনি বাতি জ্বলে উঠে। বাথরুমের সিংকেও সমস্যা। আপনাআপনি পানি পড়ে। সে কল বন্ধ করে বিছানায় শোয়ামত্রি কল দিয়ে পানি পড়তে থাকে।

কুদ্দুস গেল হোটেলের রিসিপশনে বসা ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেইন করতে। সেখানে আরেক কাণ্ড।

ম্যানেজারের জায়গায় অতি রূপবতী এক তরুণী বসে আছে। তরুণীর বয়স ষোল সতেরো। পরনের শাড়ির রঙ লাল। গা ভর্তি গহনা। তার গাত্রবর্ণ দুধে আলতায়। তরুণী কুদ্দুসকে দেখে বলল, স্যার কয়টা বাজে?

কুদ্দুস বলল, বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি।

তরুণী বলল, স্যার তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যান। বারোটা বাজলে একটা ঘটনা ঘটবে। আপনি ভয় পেতে পারেন।

কুদ্দুস বলল, কী ঘটবে?

সানাউল্লাহ বই পড়া বন্ধ করলেন। তার ভয় ভয় লাগছে। বারোটা বাজরে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে এটা বুঝা যাচ্ছে। অতিরিক্ত ভয় পেলে ঘুম চটে যেতে পারে। তারচেয়ে রফিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করা যেতে পারে। সে এখনো ক্ষমা চায় নি এটাও এক সমস্যা। তাকে দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ক্ষমা চাওয়ানো দরকার।

রফিক।

জি স্যার।

মানুষ ভুল করে। করে না?

অবশ্যই করে। তয় নিজের ইচ্ছায় করে না।

কার ইচ্ছায় করে?

শয়তানের ইচ্ছায় করে। মানুষের কোনো দোষ নাই। সব দোষ শয়তানের।

শয়তানের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিলে তো হবে না রফিক।

শয়তানের ঘাড়ে চাপাব না তো কার ঘাড়ে চাপাব?

সানাউল্লাহ হতাশ গলায় বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে এই নিয়ে পরে আলাপ হবে। আরেকটা কথা বলে রাখি যদি কখনো দেখিস এই বাড়িতে দুটা ভূতের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে— ভয় পাবি না।

রফিক বলল, ভয় পাব কি জন্যে? আমার দেশের বাড়িতে যাইতে হয় গোরস্থানের কিনার দিয়া। গভীর রাত্রে বাড়ি যাইতাছি হঠাৎ তাকায় দেখি গোরস্থানের তালগাছ সমান উঁচা এক লোক। বুঝলাম জিন।

জিনটা কি করল?

কিছুই করল না। সে তার মতো গোরস্তানে হাঁটাহাটি করতে লাগল— আমি আস্তে বাড়ি চইলা আসলাম।

রফিক বলল, না।

ডরাইলেই ডর। না ডরাইলে কিসের ডর?

# ৪. সকাল আটটা বাজার আগেই

সকাল আটটা বাজার আগেই, হামিদুর রহমান উপস্থিত। সানাউল্লাহ তখন নাশতা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন। আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সিগারেট তিনি খান না। রফিক এক প্যাকেট কিনে এনেছে। প্যাকেটটা রেখেছে রান্নাঘরের ফ্রিজের ওপর। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, সিগারেট তো খাই না। তুই সিগারেট আনলি কেন?

রফিক বলল, টেকার ভাংতি পাই না এইজন্যে কিনলাম। কোনোদিন যদি মন মিজাজ খুব খারাপ থাকে একটা টান দিবেন। আবার যদি মন মিজাজ খুব ভালো থাকে আরেকটা টান দিবেন। গেল ফুরাইল।

সানাউল্লাহর মন মেজাজ অজি অতিরিক্ত ভালো, সেই হিসেবে সিগারেট ধরিয়েছেন। হামিদকে দেখে তার কলিজা অনেকখানি শুকিয়ে গেল। হামিদ অতি পঁাচ খেলা লোক। হামিদের কথাই তিনি তার বন্ধু আবু করিমকে বলেছিলেন। স্বভাব গিরগিটির মতো। সরকার বদলের সঙ্গে দলবদল। নিজের ক্যাডার বাহিনী আছে। এদের দিয়ে তিনি যাবতীয় কুকর্ম করান।

হামিদ, সানাউল্লাহ্র খালাতো ভাই। যখন সানাউল্লাহর স্ত্রী জীবিত ছিলেন তখন বিপদেআপদে হামিদকে ডাকতেন। এখন যোগাযোগ নেই। হামিদ সানাউল্লাহর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে কড়া গলায় বললেন, সিগারেট ফেল। সকালবেলা বিষ হাতে নিয়ে বসে আছ। সিগারেটের আরেক নাম যে Death stick তা জানো?

না।

এখন জানলে। সিগারেট ফেল।

সানাউল্লাহ্ আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিলেন। হামিদ বুকপকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন! গত রাতে জাবিনের সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর কথা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি তিনি কাগজে লিখে রেখেছেন। তাঁর আলজিয়ার্সের মতো হয়েছে। অনেক কথাই মনে থাকে না। কিছুদিন আগে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটেছে। ওয়ার্ড কমিশনারদের এক মিটিং। মেয়র সাহেবের খাসকামরায় মিটিং শুরু হয়েছে। তখন তিনি ভুলে গেলেন তার দল কী। তিনি কি বিএনপির না-কি আওয়ামী লীগের। বক্তব্য দিতে হলে দল বিবেচনা করে দিতে হবে। আওয়ামী লীগ হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন দিয়ে শুরু করতে হবে। তিনি বিএনপির কেউ হলে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার আদর্শ নিয়ে শুরু করতে হবে। এত বড় একটা মিটিং হলো, অথচ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। মেয়র সাহেব এক পর্যায়ে বললেন, হামিদ সাহেব! আজ দেখি আপনি চুপচাপ। কিছু বলবেন?

হামিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কিছু বলব না।

হামিদ হাতের কাগজের দিকে তাকালেন। প্রথমেই লেখা— ব্যাটারি খাওয়া। এ থেকে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আরো বিস্তারিত ভাবে লেখা উচিত ছিল। জাবিনের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন সবই পানির মতো পরিস্কার ছিল। এখন সব ঘোলাটে লাগছে।

হামিদ গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন, গত রাতে জাবিন মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। সে কিছু বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এখন বলো ব্যাটারি খাওয়া বিষয়টা কী? কোনো কিছু গোপন করবার চেষ্টা করবে না। আজ পর্যন্ত কেউ তথ্য গোপন করে আমার কাছ থেকে পার পায় নাই। বলো ব্যাটারি খাওয়াটা কী?

সানাউল্লাহ বললেন, ব্যাটারি খাওয়া মানে ব্যাটারির খোসা ছাড়িয়ে পেস্টের মতো যে ক্যামিকেল আছে সেগুলি খেয়ে ফেলা। শুধু কঠিন দন্ডটা খাওয়া যাবে TI

কে খাচ্ছে ব্যাটারি?

আমি খাচ্ছি।

কেন? এটা কি কোনো মেডিসিন?

সানাউল্লাহ বললেন, অবশ্যই মেডিসিন। নানান ধরনের ইলেকট্রলাইট সেখানে থাকে। শরীরের ইলেকট্রলাইট ব্যালেন্সের জন্যে কার্যকর।

হামিদ বললেন, কী কী অসুখে কাজ করে?

বাধর্ক্যজনিত অসুখে।

হামিদ বললেন, ভুলে যাওয়া রোগে কাজে আসবে? ইদানিং সবকিছু ভুলে যাচ্ছি।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সানাউল্লাহ বললেন, খেয়ে দেখতে পারে।

হামিদ বললেন, ডোজ কী? মানে দিনে কয়টা ব্যাটারি খাব?

সানাউল্লাহ বললেন, সাতদিনে একটা করে শুরুতে খেয়ে দেখতে পারেন। A সাইজ ব্যাটরি।

হামিদ বললেন, যা বলার পরিষ্কার করে বলো। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিলে তো বুঝব না। নতুন ব্যাটারি খাব, না-কি চার্জ শেষ হয়ে গেছে এমন ব্যাটারি?

নতুন ব্যাটারি।

হামিদ বললেন, তোমার কাজের ছেলেকে পাঠাও, কিছু ব্যাটারি নিয়ে আসুক। প্রথম ডোজ তোমার সামনেই খাই।

সানাউল্লাহ বললেন, রফিক ব্যাটারি কিনতেই গেছে। একপাতা ব্যাটারি কিনবে। সেখান থেকে আপনি চারটা নিয়ে নেবেন। এক মাসের ওষুধ।

খালিপেটে খেতে হবে?

এরকম কোনো নিয়ম নাই। ভাতের সঙ্গে আচারের মতোও খেতে পারেন।

হামিদ আবার কাগজের দিকে তাকালেন, সেখানে লেখা ডমরু। ডমুরু মানে কী? তিনি নিজে কি লিখতে ভুল করেছেন? ডুমুর লিখতে গিয়ে ডমরু লিখেছেন। তারপরেও নিশ্চিত হবার জন্যে বললেন, ডুমুর ব্যাপারটা কী?

সানাউল্লাহ বললেন, ডুমুর একটা ফল।

তা জানি। ডুমুরের ইংরেজিও জানি– Fig. জাবিন ডুমুরের বিষয়ে কী জানতে চাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ব্যাটারি খাবার পর ডুমুর খেতে হয় এমন কিছু?

সানাউল্লাহ বললেন, খেলে ভালো। না পাওয়া গেলে অন্য ফলও খাওয়া যায়।

ভূতের বাচ্চা বিষয়ে জানতে চেয়েছে। ভূতের বাচ্চার ব্যাপারটা কী?

ভুতের বাচ্চা হচ্ছে অল্পবয়স্ক ভূত। ইংরেজিতে বেবি ঘোস্ট বলা যেতে পারে। ভূতদের মধ্যে যেমন বুড়ো হাবড়া আছে আবার অল্পবয়স্ক ভূতও আছে।

হামিদ বললেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। সানাউল্লাহ বললেন, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি। ছোটবেলায় তেঁতুল গাছে একটা শাকচুন্নি বসে থাকতে দেখেছি। সে একটা ইতিহাস। এখনো মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়। এই দেখ গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

সানাউল্লাহ বললেন, ঘটনাটা বলুন শুনি।

হামিদ বললেন, দাড়াও বলি— ভয়ঙ্কর ব্যাপার। শ্রাবণ মাস। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে...

এই বলেই হামিদ থেমে গেলো আর কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। তিনি হতাশ চোখে সানাউল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কিছু মনে পড়ছে। তোমাকে বললাম আমার বিস্মরণ রোগ হয়েছে। ব্যাটারি আসুক, খেয়ে দেখি কোনো উপায় হয় কি-না। যে যা খেতে বলছে তাই খাচ্ছি। কোনো উপকার পাচ্ছি না। একজন বলল, ছাগলের লেদা মধু মাখিয়ে চুষে চুষে খেতে। স্মৃতি নষ্টের এটা না-কি ধন্বন্তরী ওষুধ। তাও একবার খেলাম।

উপকার হয়েছিল?

কী উপকার হবে! বমিটমি করে সর্বনাশ। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। ভোটার আই ডি করতে গিয়েছি। জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনার বাবার নাম? কিছুতেই বাবার নাম মনে করতে পারলাম না। চিন্তা কর অবস্থা। বাবার নাম ভুলে গেছি। স্বীকারও করতে পারছি না।

তখন কী করলেন?

চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। বললাম, বাবার নাম আদম। বাবা আদম আমাদের সবারই বাবা, সেই হিসাবে বললাম, আদম। বুদ্ধি ভালো বের করেছি না?

অবশ্যই।

রফিক একপাতা ব্যাটারি করে এসেছে। সেখান থেকে একটা ব্যাটারির অর্ধেকের কিছু বেশি হামিদ খেয়ে ফেললেন। মুক বিকৃত করে বললেন, অতি অখাদ্য।

সানাউল্লাহ বললেন, অখাদ্য তো হবেই। ওষুধ তো খাদ্য না।

তাও ঠিক। মেড ইন চায়না ব্যাটারি, এই নিয়ে একটু চিন্তা লাগছে। চায়নিজরা দুধের মতো শিশুখাদ্যে বিষাক্ত মেলামিন দিয়েছে। ব্যাটারিতে এরকম কিছু দিয়েছে কি-না কে জানে।

হামিদ এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে ক্রমাগত ঢেঁকুর তুলতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বললেন। ঢেঁকুরের সঙ্গে পিসাবের মতো গন্ধ আসছে।

সানাউল্লাহ বললেন, আপনি অ্যামোনিয়ার গন্ধে পাচ্ছেন। ব্যাটারি থেকে অ্যামোনিয়ার গন্ধ আসে।

বুক ধড়ফড় করছে।

সানাউল্লাহ বললেন, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন?

বুঝতে পারছি না। চায়নিজ ব্যাটারি খাওয়াটা ভুল হয়েছে। আমেরিকা বা ইউরোপের ব্যাটারি খাওয়া উচিত ছিল।

হামিদের চখ-মুখ কিছুক্ষণের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারণ ছেলেবেলায় শাকচুনি দেখার গল্পটা তার পুরোপুরি মনে পড়েছে। ব্যাটারি ওষুধের ক্ষমতায় তিনি মুগ্ধ। তিনি বললেন, চায়নিজ ব্যাটারি হলেও পাওয়ার খারাপ না। শাকচুন্নির ঘটনাটা মনে পড়েছে। বলব?

বলুন শুনি।

শ্রাবণ মাস। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাগরেবের নামাজ শেষ হয়েছে। আমি মূল বাড়ি থেকে বাংলাঘরে যাচ্ছি। বাংলাঘরের দক্ষিণে একটা তেঁতুল গাছ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তেঁতুল গাছের ডালে পা ছড়িয়ে একটা শাকচুন্নি বসে আছে। আমি বললাম, এটা কে? শাকচুন্নিটা বলল, তুই হামিদ না? তুই আমারে চিনস না? তোরে ধইরা একটা আছাড় যদি না দিছি।

বলেই সে দুটা লম্বা হাত আমার দিকে বের করল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

একবারই দেখেছেন, না আরো কয়েকবার দেখেছেন?

আমি একবারই দেখেছি। তবে আমাদের বাড়ির অনেকেই কয়েকবার করে দেখেছে। তেঁতুল গাছ কাটাবার কথা উঠল। তখন মা বললেন, ভিটাতে যেমন বাস্তুসাপ থাকে সেরকম বাস্তুভূতও থাকে। এদের তাড়ানো ঠিক না। সে থাকুক তার মতো। ক্ষতি তো তেমন করছে না। ছোট পুলাপানকে ভয় দেখায় আর টিনের চালে ঢিল মারে। এর বেশি কিছু তো করে না।

মার কথায় তেঁতুল গাছ আর কাটা হয় নি।

শাকচুন্নিটা এখনো আছে?

থাকতে পারে। রাজনীতিতে ঢোকার পরে দেশের বাড়িতে আর যাওয়া হয়। জনগণের সেবা করতে গিয়ে নিজের বাড়িঘর ভুলে গেছি, তার মূল্যায়ন কই! খামাখা তিন মাস জেল

খাটলাম। পত্রিকায় ছবি দিয়ে নিউজ করল–সন্ত্রাসী গ্রেফতার। দেশের জন্যে কিছু করাই হয়েছে সমস্যা। আচ্ছা আজকে যাই।

হামিদ চলে যাওয়ার দুঘণ্টার মধ্যে জাবিন টেলিফোন করল। তিনি তখন নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানে। লাইব্রেরির মালিক কাদের খান, সানাউল্লাহর জন্যে সিঙ্গাড়া আনিয়েছেন। মিনি সিঙ্গাড়া। একসঙ্গে দুটা তিনটা মুখে দেয়া যায়। এমন সময় জাবিনের টেলিফোন। জাবিন মহা উত্তেজিত।

বাবা, তুমি হামিদ আংকেলকে ব্যাটারি খাইয়ে দিয়েছ?

সানাউল্লাহ বললেন, আমি কেন ব্যাটারি খাওয়াব? উনি নিজের আগ্রহে খেয়েছেন। তাও পুরোটা খান নাই। অর্ধেকের মতো খেয়েছেন। তিনটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। পরে খাবেন।

বাবা, কী হচ্ছে আমি কি জানতে পারি?

তেমন কিছু হচ্ছে না রে মা, ব্যাটারি খাওয়া হচ্ছে। কেউ যদি আগ্রহ করে ব্যাটারি খেতে চায় সেখানে আমাদের কী বলার আছে? কথায় আছে আপরুচি খানা।

বাবা, তুমি কি খবর পেয়েছ ব্যাটারি খেয়ে এখন তার কী অবস্থা? প্রচণ্ড পেটে ব্যাথা। তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। কথাবার্তাও বলছেন পাগলের মতো। ডাক্তার সাহেব হামিদ আংকেলকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার নামটা বলুন। হামিদ আংকেল বললেন,

নিজের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে আমার বাবার নাম আদম। আর মার নাম হাওয়া। এই দুজনের নাম মনে আছে।

সানাউল্লাহ বললেন, মা, এই বিষয়ে পরে কথা হবে। আমি সিঙ্গাড়া খাচ্ছি। সিঙ্গাড়া মুখে নিয়ে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে। খাদ্য মুখে নিয়ে কথা বলা অত্যন্ত রিস্ক। শ্বাসনালিতে খাদ্য ঢুকে যেতে পারে।

সানাউল্লাহ মোবাইল ফোন পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। কাদের খান কান। খাড়া করে সানাউল্লাহর কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি বললেন, স্যার যদি কিছু মনে না করেন ব্যাটারি খাওয়ার একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। কে ব্যাটারি খেয়েছে?

সানাউল্লাহ বললেন, আমার খালাতো ভাই। ব্যাটারি তার স্টোমাক নিতে পারে নি। কারণ ব্যাটারি মূলত ভূতদের খাদ্য। হামডু ডুমরু আগ্রহ করে খায়।

আপনার বাড়িতে যে দুটা ভূতের বাচ্চা থাকে তাদের কথা বলছেন?

হুঁ।

ওরা এখনো আছে?

যাবে কোথায়? বাবা মা ফেরার।

কাদের খান বললেন, স্যার, আপনাকে একটা ছোট্ট অনুরোধ করব। ভূতের বাচ্চা দুটাকে নিয়ে একটা বই লিখে ফেলেন। শিশুতোষ রচনা। আমরা ছাপব। ধ্রুব এষকে দিয়ে কভার

করাব। ভেতরে চার কালারের ইলাসট্রেশন থাকবে। বাচ্চারা ভূত-প্রেতের গল্প খুব পছন্দ করে।

সানাউল্লাহ বললেন, ভূত নিয়ে একটা বই লেখার আমার পরিকল্পনা আছে। তবে গল্প-উপন্যাস না। গবেষণামূলক। যেমন ভূতদের সমাজ ব্যবস্থা। তাদের রাজনীতি। তাদের খাদ্যাভ্যাস। শ্রেণীভেদ।

কাজ কি শুরু করেছেন?

চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। শিগগিরই লেখা ধরব। ভূত সম্পর্কে আমাদের অনেক অজ্ঞতা আছে, সেইসব দূর করতে হবে। যেমন ধরুন, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি পেত্নী এবং শাকচুন্নি এই দুয়ের মধ্যে তফাত কী? আপনি কি বলতে পারবেন?

জি-না।

সানাউল্লাহ বললেন, একজনের খোঁজ পেয়েছি— থিয়সফিষ্ট। প্রেতচর্চা করেন। ভালো মিডিয়াম। চক্রে বসে ভূতদের ডাকলেই তারা চলে আসে। তার সঙ্গে অনেক ঝামেলা করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। পরশু সন্ধ্যায় যাব।

কাদের খান বললেন, স্যার, আমাকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার খুব শখ।

সানাউল্লাহ বললেন, আপনি যেতে চাইলে অবশ্যই যাবেন।

কাদের খান বললেন, স্যার, আপনি যে ভূতের বইটা লিখবেন তার নাম ঠিক করেছেন?

হুঁ। ভূতের ক খ গ।

নামটা বদলাতে হবে স্যার। তসলিমা নাসরিন এই ধরনের নাম ব্যবহার করে নানান কেচ্ছা কাহিনী বলেছেন। ভূতের ক খ গ শুনলে সবাই ভাববে ভূতদের প্রেমলীলা।

ভূতবৃত্তান্ত নামটা কেমন?

কঠিন নাম। আরো সহজ কিছু দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গান ভেঙে একটা নাম দিলে কেমন হয় স্যার? রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে—দিনের শেষে ঘুমের দেশে। আপনি বইটার নাম দিলেন— দিনের শেষে ভূতের দেশে।

সানাউল্লাহ বললেন, নামটা খারাপ না।

কাদের খান বললেন, স্যার, আপনার এই বই আমরা ছাপব। আপনি আর কাউকে দিতে পারবেন না। পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি স্যার। রয়েলটির অ্যাডভান্স। আপনি না বললে শুনব না।

সানাউল্লাহ রয়েলটির পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা ভিসিডি প্লেয়ার কিনলেন। সন্ধ্যার পর তেমন কিছু করার থাকে না। হম ডমরুকে নিয়ে হিন্দি ছবি দেখা যেতে পারে।

শুধু মানুষের বিনোদন দেখলে চলবে না। ভূতের বিনোদনের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবার বিনোদন দরকার।

ভিসিডি প্লেয়ারের সঙ্গে তিনি মেড ইন আমেরিকার দুটা A সাইজ ব্যাটারিও কিনলেন। হামিদকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া দরকার। খালি হাতে যাওয়া ঠিক না। আগে রোগী দেখতে হরলিক্সের কৌটা নিয়ে যাবার নিয়ম ছিল। কলেজে পড়ার সময় তার একবার জন্ডিস হয়েছিল। তার আত্মীয়স্বজনরা সবাই হরলিক্সের কৌটা নিয়ে রোগী দেখতে এসেছিলেন। সেবার সর্বমোট উনিশটা হরলিক্সের কৌটা পেয়েছিলেন।

এখন বাংলাদেশ বদলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। এখন আর হরলিক্সের কৌটা নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্যাটারি নিয়ে যাওয়া যায়। মেড ইন আমেরিকা ব্যাটারির প্রতি হামিদ যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। ব্যাটারি খাওয়া না-খাওয়া পরের কথা। ব্যাটারি পেয়ে সে খুশি হবে তা ধরে নেয়া যায়।

সানাউল্লাহ দুটা বর্ণমালার বই কিনলেন। ভূতছানাদের বর্ণমালা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা। শিক্ষার ব্যাপারে ভূতরা কতটুকু আগ্রহী তিনি জানেন না। ওদের শেখাতে হবে কায়দা করে। তিনি রফিককে শেখাবেন, তাই দেখে দেখে ওরাও শিখবে। অনেকটা ঝি মেরে বৌকে শেখানো টাইপ।

তিনি নিজের জন্যে তিনশ পাতার চামড়ায় বাঁধানো খাতা এবং একডজন বলপয়েন্ট কিনলেন। ভূত বিষয়ক গ্রন্থ লিখে শেষ করতে হবে। এডভান্স টাকা নেয়া হয়ে গেছে। এখন আর কাজ ফেলে রাখা ঠিক না। দৈনিক দশপাড়া করে লিখলেও তিনশ পাতা লিখতে ত্রিশ দিন লাগবে। এক মাসের ধাক্কা।

ক্লিনিকে হামিদ আধামরার মতো পড়ে আছেন। তাঁকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। হামিদের দুজন ক্যাডার প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে কামরার বাইরে বসা। দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন যেন ভিড় না করে সেই ব্যবস্থা। যে রোগী দেখতে যাবে সে ঘড়ি ধরে দুমিনিট থাকবে। দুমিনিটের বেশি কেউ থাকলে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে।

ক্যাডারদের একজনের চেহারা বাঁদরের মতো। কথাবার্তাও বাদরের মতো কিচকিচ করে বলে। সে বলল, স্যার হাতে ঘড়ি আছে?

সানাউল্লাহ বললেন, না।

অসুবিধা নাই। আমাদের সঙ্গে ঘড়ি আছে। দুই মিনিট টাইম। আমরা আউট বললেই দ্রুত বের হবেন। ওস্তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে বিরক্ত করা ডাক্তারের নিষেধ আছে। ওস্তাদ কাউকে চিনতে পারছেন না। আপনাকেও চিনতে পারবেন না। নিজের পরিচয় দেবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। বুঝেছেন?

জি।

যান ঢুকে যান।

সানাউল্লাহ ঢুকে পড়লেন। হামিদ বিছানায় শোয়া। সানাউল্লাহকে দেখে মাথা তুললেন। সানাউল্লাহ বললেন, আপনার জন্যে মেড ইন আমেরিকা ব্যাটারি নিয়ে এসেছি।

হামিদ বললেন, এখন খাব? সেটা আপনার বিবেচনা। আমাকে কি চিনেছেন?

না। তবে তোমার পিতার নাম জানি— বাবা আদম। হয়েছে?

জি হয়েছে।

একটা ব্যাটারির খোসা খুলে দাও। খেয়ে ফেলি। ডাক্তাররা দেখলে খেতে দেবে না। ভালো কথা, ড্রেট অব এক্সপীয়রি দেখে এনেছ?

হ্যাঁ।

সানাউল্লাহ রোগীর পাশে রাখা ফলের প্লেট থেকে ছুরি নিয়ে অতি দ্রুত ব্যাটারির খোসা ছাড়িয়ে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। হামিদ বললেন, এটার টেস্ট অনেক ভালো। আমেরিকা বলে কথা। একটা দেশ তো খামাখা এত বড় হয় না। কী বলো?

অবশ্যই।

ঐ ব্যাটারিটা আমার বালিশের নিচে রেখে দাও। সুযোগ বুঝে খেয়ে ফেলব।

সানাউল্লাহ বললেন, আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দিতে হবে। একজনকে জনসমক্ষে চড় থাপ্পর দিতে হবে। কানে ধরে ঘুরতে হবে।

হামিদ বললেন, কোনো ব্যাপারই না। তার নাম। কোথায় থাকে। কখন পাওয়া যাবে সব লিখে ব্যাটারির সঙ্গে আমার বালিশের নিচে রেখে যাও। তোমার নাম এখন মনে পড়েছে। তুমি জাবিন মার বাবা। তোমার নাম সানাউল্লাহ। আমেরিকান ব্যাটারির গুণ দেখেছ? খাওয়ামাত্র অ্যাকশন।

সানাউল্লাহ নাম ঠিকানা লেখে বালিশের নিচে রাখলেন।

বাইরে থেকে বান্দরটা বলল, স্যার আউট। দুই মিনিটের বেশি হয়ে গেছে।

সানাউল্লাহ দ্রুত বের হয়ে এলেন।

রাত দশটা। ভিসিডিতে ছবি চলছে। ছবির নাম গজনি। বিরাট মারামারি কাটাকাটি। রফিক হা করে দেখছে। রফিকের পাশেই হুমড়ু ডমরু। রফিক এই দুই ভাইবোনকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে সানাউল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন। ছবির দিকে সানাউল্লাহর কোনো নজর নেই। তিনি খাতা নিয়ে বসেছেন। প্রথম পাতায় বড় বড় করে লিখলেন—

সানাউল্লাহ প্রণীত
দিনের শেষে ভূতের দেশে
ভূত বিষয়ক যাবতীয় তথ্যের প্রামাণ্য সংকলন

ক্রমাগত টেলিফোন বাজছে। নিশ্চয়ই জাবিনের টেলিফোন। তিনি টেলিফোন ধরলেন না। জরুরি লেখা নিয়ে বসেছেন। এখন কথা চালাচালির সময় না। টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। তিনি মহাবিরক্ত হয়ে সেট হাতে নিলেন।

বাবা, রাতে তোমার টেলিফোন করার কথা। তুমি টেলিফোন কর নি।

মারে, অসম্ভব ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে যাচ্ছি।

কী নিয়ে ব্যস্ত?

ভূতদের নিয়ে একটা গবেষণামূলক বই লিখছি। বইয়ের প্রকাশকও ঠিক হয়ে গেছে— মনোয়ারা পাবলিকেশন হাউস। মনোয়ারা হচ্ছে প্রকাশক কাদের সাহেবের স্ত্রী। বৎসর দুই আগে ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। কাদের সাহেব স্ত্রীভক্ত মানুষ তো। তিনি স্ত্রীর নামে পাবলিকেশনের নাম দিয়েছেন। আগে নাম ছিল— স্বাধীন পাবলিকেশন লিমিটেড।

জাবিন বলল, হড়বড় করে এসব কী বলছ? আগে তো তুমি এত কথা বলতে। তোমার সমস্যা কী?

সানাউল্লাহ বললেন, লেখকদের যে সমস্যা আমারও একই সমস্যা। মাথার ভেতর লেখা ঘুরপাক খাচ্ছে তো। এই কারণে কী বলছি, কতক্ষণ ধরে বলছি তা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আমার বইটার নাম দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এটা একটা আশার কথা।

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে নাম দেবেন? তিনি কি বেঁচে আছেন না-কি?

সানাউল্লাহ বললেন, তাঁর মতো মহাপুরুষদের মৃত্যু নেইরে মা। যে কারণে তিনি নিজেই নিজের মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন এনেছিলে সাথে তুমি মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

জাবিন বলল, বাবা, তুমি তোমার জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলো। আমি তোমার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না। নাও ধর।

সানাউল্লাহ অস্বস্তির সঙ্গে টেলিফোন ধরলেন। জাবিনের বরকে তিনি সামান্য ভয় পান। শ্বশুর হয়ে জামাইকে ভয় পাওয়া অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার। মানবজীবন হলো হাস্যকর ঘটনাবলীর সমষ্টি।

বাবা, কেমন আছেন?

ভালো।

আপনার জন্যে একটি সুসংবাদ আছে। বলব?

বলো।

অস্ট্রেলিয়ায় ইমিগ্রেশনের জন্যে আপনার যে সব কাগজপত্র জমা দেয়া হয়েছিল সেখানে কিছু সমস্যা ছিল, তারপরেও আপনি ইমিগ্রেশন পেয়ে গেছেন।

ও।

বাবা Congratulation. বাকি জীবন আপনি অতি সুসভ্য দেশে থাকবেন। ক্যাঙ্গারু দেখবেন।

সানাউল্লাহ বললেন, হুঁ।

আগামী মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে আপনাকে চলে আসতে হবে। আমি জানি আপনি নিজ থেকে আসবেন না। কাজেই আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। বাবা, ঠিক আছে?

হুঁ।

ঢাকায় আপনার যে জায়গাটা আছে পাঁচ কাঠা না?

হুঁ।

জায়গাটা তো মোটামুটি প্রাইম লোকেশনে। আমরা একটা ডেভেলপারকে দিয়ে দিব। তারা মাল্টি স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস বানাবে। দুটা থাকবে আপনার নামে। দেশে যখন বেড়াতে আসবেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠবেন।

সানাউল্লাহ বললেন, একটা সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

আমার বাড়ির সামনে একটা কাঠাল গাছ আছে। ডেভেলপারকে দিলে তারা কাঁঠাল গাছটা কেটে ফেলবে। তখন ভূতের বাচ্চা দুটা যাবে কই? ওরা তো কাঁঠাল গাছেই থাকে।

বাবা, আমি তো নিজেই আসছি। তখন কাঁঠাল গাছে, গাছের ভূত এইসব নিয়ে Detail কথা হবে। গুড নাইট।

গুড নাইট।

সানাউল্লাহ লেখায় মন দেবার চেষ্টা করছেন। মন বসছে না। নিজের দেশ ফেলে ছাতার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে থাকতে হবে। ক্যাঙ্গারু দেখতে হবে? দেখার মতো কী আছে এই অদ্ভুটার ভেতর? এত বড় জন্তু ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে।

ভিসিভিতে ছবি শেষ হয়েছে। রফিক ঘুমুতে চলে গেছে। সানাউল্লাহ ডাকলেন, হমড়ু।

হমড়ু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, জি।

তোদের নিয়ে গবেষণামূলক বই লিখছি। তোরা সাহায্য না করলে পারব না। আমার হাতে সময় কম। আমাকে চলে যেতে হবে অস্ট্রেলিয়ায়, ক্যাঙ্গারু দেখতে হবে। যাই হোক, তোরা রেস্ট নে আমি বইয়ের ইনট্রোডাকশনটা লিখে ফেলি।

# ৫. পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর

পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর— ডাক্তারের চেম্বারে সন্ত্রাসী হামলা। হামলায় ডাক্তারের একজন অ্যাসিসটেন্ট এবং তিনজন রোগী গুরুতর আহত। ব্যাপক ভাঙচুর।

সানাউল্লাহ খবর পড়ে আনন্দ পেলেন। হামিদ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েও কাজকর্ম চালাতে পারছে এটা আশার কথা। তিনি খবরের কাগজ সঙ্গে নিয়েই আবু করিমের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পত্রিকা বন্ধুর সামনে মেলে বললেন, খবর পড়েছ?

আবু করিম বললেন, পড়েছি। এই দেশে বাস করা যাবে না। ডাক্তারের চেম্বারে সন্ত্রাসী হামলা, চিন্তা করা যায়? সব ছেড়ে-ছুড়ে বনে চলে যেতে ইচ্ছা করে। তোমার করে না?

সানাউল্লাহ জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এখন মনে হচ্ছে সন্ত্রাসী হামলার পুরো ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভালো।

ডা. আবু করিম বললেন, তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? সাতদিন হয়ে গেল তোমার খোঁজ নাই। এদিকে নতুন একটা প্রিপারেশন রেডি করেছি। টেস্টার

সানাউল্লাহ বললেন, প্রিপারেশনটা কী?

ভাতের আচার।

ভাতের আচার হয় না-কি?

আবু করিম বললেন, হওয়ালেই হয়। সারা পৃথিবীতে ভাত দিয়ে অনেক কিছু হয়। জাপানিরা বানায় রাইস ওয়াইন। চায়নিজরা বানায় রাইস টি। কোরিয়ানরা ভাতের সঙ্গে শুকরের চর্বি মিশিয়ে ফার্মেন্টেড করে কী যেন বানায়। নববর্ষে খায়। নামটা ভুলে গেছি।

সানাউল্লাহ বললেন, ভাতের আচারটা কীভাবে বানিয়েছ?

আবু করিম বললেন, শীলপাটায় ভাত পিষে মন্ত্রে মতো করেছি। মার্বেলের গুলির মতো গুলি বানিয়ে রোদে শুকিয়েছি। এদিকে তেতুলের রস, আস্ত অড়বড়ই, আস্ত আমলকি, আমচুর, শুকনা মরিচ, পাঁচ ফুরন দিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন Semisolid বস্তু তৈরি করেছি। তার ভেতর ভাতের মার্বেল ছেড়ে দিয়ে রোদে শুকিয়েছি।

সানাউল্লাহ বললেন, শুনে তো অসাধারণ লাগছে।

আবু করিম বললেন, একটা ভয় ছিল ভাতের মার্বেলের ভেতর রস ঢুকবে কি-না। রস ঢুকেছে। এক্ষুনি আনছি খেয়ে দেখো।

সানাউল্লাহ ভাতের মার্বেল আস্ত একটা মুখের ভেতর ঢুকালেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে গেলেন।

আবু করিম আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কেমন বুঝছ?

সানাউল্লাহ বললেন, এতই সুস্বাদু যে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে বাকি জীবন মুখে নিয়ে বসে থাকি।

আবু করিম বললেন, এটার প্রিপারেশনই মুখে নিয়ে বসে থাকার প্রিপারেশন। আস্তে আস্তে ভাতের গোল্লা থেকে রস বের হবে।

অসাধারণ। পেটেন্ট করে ফেলা উচিত। পেটেন্ট না করলে অন্যকেউ প্রচার করে ফেলতে পারে। দেখা যাবে চ্যানেল আইয়ের রান্নার অনুষ্ঠানে কেকা ফেরদৌসি ভাতের আচারের রেসিপি দিয়ে দিচ্ছেন।

আবু করিম বললেন, তাহলে তো চিন্তার বিষয়। পেটেন্ট অফিসে খোঁজ নেয়া উচিত আচারের পেটেন্ট হয় কি-না। আন্তর্জাতিক কোনো পেটেন্ট কোম্পানির সঙ্গেও যোগাযোগ করা দরকার। কষ্ট করে একটা জিনিস বানালাম, দেখা গেল জাপানিরা বাজারে ছেড়ে দিল। নাম দিল কেও মেও। কোটি কোটি ডলারের বিজনেস হাতছাড়া হয়ে গেল।

সানাউল্লাহ বললেন, আচারের নতুন কী প্রজেক্ট হাতে নিয়েছ?

আবু করিম বললেন, নেশাখোরদের জন্যে তামাকের একটা আচার বানিয়েছি। যারা জর্দা, সিগারেট, গাঁজা এইসব খায় তাদের জন্যে। এই জিনিস বাজারে ছাড়া ঠিক হবে না। দেখা যাবে এই আচার খেয়েই সবাই নেশা করছে।

সানাউল্লাহ বললেন, আচারটা বানিয়েছ কী দিয়ে?

আবু করিম বললেন, তামাক পাতা, চা পাতা, গাঁজা গাছের পাতার সঙ্গে ভিনিগার এবং সৈন্ধব লবণের প্রিপারেশন। এর সঙ্গে সমপরিমাণ কাগজি লেবুর রস দিয়েছি। একটা আস্ত বোম্বাই মরিচ ছেড়ে দিয়েছি।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

খেয়ে দেখেছ?

এক চামচ খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। দুবোতল বানিয়েছি। একটা বোতল তুমি নিয়ে যেও। তবে না খাওয়াই ভালো। সব আবিষ্কার সমাজের জন্যে মঙ্গলজনক হয় না। যেমন ধর অ্যাটম বোমা। এই বোমা সমাজের কোনো উপকার করে নি। ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে নিয়ে এসেছে।

তোমার এই আচারের নাম কী দিয়েছ?

বোমা-আচার।

নাম ভালো হয়েছে, তবে রবি ঠাকুরের কাছ থেকে নাম ধার নিলে ভালো হতো। বিশ্বকবির নামের সঙ্গে আচারের নাম যুক্ত থাকত।

আবু করিম বললেন, আচার নিয়ে কি তাঁর কোনো কবিতা আছে?

সানাউল্লাহ বললেন, আছে নিশ্চয়ই। এত লিখেছেন– আচার নিয়ে কিছু লিখেবন না তা হতেই পারে না। আমার অবশ্যি জানা নেই। রবীন্দ্রভক্তদের কাছ থেকে খোঁজ নিতে হবে। তবে আমসত্ত্ব নিয়ে তাঁর কবিতা যেহেতু আছে, আচার নিয়েও থাকার কথা।

আমসত্ত্ব নিয়ে কবিতা আছে? বলো কী! কী কবিতা?

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,

সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে–
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া পাতে।

আবু করিম বললেন, পিঁপিড়া কেঁদে যাচ্ছে বিষয়টা বুঝলাম না। পিঁপিড়া কেন কাঁদবে?

সানাউল্লাহ বললেন, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। কবিগুরু বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম। উনি মারা গিয়ে সাহিত্যের ক্ষতি তো করেছেনই, আরো অনেক ক্ষতি করেছেন। নতুন নাম পাওয়া যাচ্ছে না। উনি বেঁচে থাকলে মোবাইল টেলিফোনে অচারের নাম জানতে চেয়ে এসএমএস পাঠাতাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে নাম দিয়ে দিতেন।

আবু করিম বললেন, তোমার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের আমসত্ত্বের কবিতাটা শোনার পর থেকে অন্য একটা আচারের আইডিয়া মাথায় ঘুরছে। বানানো ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না।

কী আইডিয়া?

পিঁপড়ার আচার।

বলো কী!

আবু করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, বলো কী বলে চেঁচিয়ে ওঠার কিছু নেই। পিঁপড়া আমরা সব সময় খাচ্ছি। চিনির সঙ্গে খাচ্ছি। চায়ের সঙ্গে খাচ্ছি। পিঁপড়ার শরীরে একটা অ্যাসিড

আছে। অ্যাসিডের নাম ফরমিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের কারণে পিঁপড়ার স্বাদ হবে টক। বাইরে থেকে কিছু টক দেয়া হবে। এবং কবিগুরুর নামে এই আচারের নাম হবে– পিপিলিকা ক্রন্দন।

পিপিলিকা ক্রন্দন?

হ্যাঁ, পিপিলিকা ক্রন্দন। এবং আচারের বোতলে কবিগুরুর ছবি থাকবে। ছবির নিচে থাকবে— এই আচারের রেসিপি কবিগুরুর রচনা থেকে প্রাপ্ত।

সানাউল্লাহ বললেন, রবীন্দ্রভক্তরা রাগ করতে পারেন।

আবু করিম বিরক্ত গলায় বললেন, রবীন্দ্রনাথ কি শুধু রবীন্দ্রভক্তদের সম্পত্তি? উনি সবার সম্পত্তি। পিঁপড়ার আচারের বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এই বিষয়ে আর কথা বলবে না। অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাইলে বলো।

সানাউল্লাহ বললেন, একটা বই লেখার বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ছিল।

আবু করিম অবাক হয়ে বললেন, বই লিখছ না-কি!

শুরু করে দিয়েছি, চার পৃষ্ঠার মতো লেখা হয়ে গেছে।

বিষয় কী?

সানাউল্লাহ ইতস্তত করে বললেন, ভূত-বিষয়ক একটা বই। যে চার পৃষ্ঠা লিখেছি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। পড়লেই বুঝবে। সানাউল্লাহ পাঞ্জাবির পকেট থেকে লেখা বের করলেন।

আবু করিম সঙ্গে সঙ্গেই লেখা পড়া শুরু করলেন।

দিনের শেষে ভূতের দেশে

ভূত আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভূত যুক্ত। বাংলা ভাষায় ভূত উঠে এসেছে বাগধারায়। যেমন, ভূতের মুখে রামনাম, সর্ষের ভেতর ভূত ইত্যাদি।
দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এই, ভূত বিষয়ে আমাদের সমক কোনো জ্ঞান নেই।

এই পর্যন্ত পড়েই আবু করিম বললেন, তোমার সমস্যাটা কী? তুমি কি মানসিকভাবে অসুস্থ?

সানাউল্লাহ বললেন, বুঝতে পারছি না। হতে পারে।

আবু করিম বললেন, মানসিক রোগী ছাড়া কারো পক্ষে ভূত নিয়ে গবেষণাধর্মী বই লেখা সম্ভব না। কারণ ভূত কোনো গবেষণার বিষয় না। কেউ কোনোদিন ভূত দেখে নি। তুমি নিজেও দেখ নি। বলো দেখেছ?

সানাউল্লাহ ক্ষীণ গলায় বললেন, হুঁ।

আবু করিম বললেন, হুঁ মানে! দেখেছ ভূত?

দেখেছি।

কোথায় দেখেছ? বাঁশঝাড়ে?

দুটা ভূতের বাচ্চা আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে বাস করছে। একজনের নাম হমডু। আরেকজনের নাম ডমরু। এরা ভাইবোন।

আবু করিম বললেন, এরা এখনো তোমার বাসায় আছে?

আছে।

আমি গেলে দেখতে পাব?

সানাউল্লাহ বললেন, রাতে গেলে দেখতে পাবে। দিনে তারা ঘুমায়। দেহধারী হয় না বলে দিনে দেখা যায় না। ওরা আবার তোমার আচারের মহাভক্ত। আমিষ আচারের বোতলটা চেটেপুটে খেয়েছে।

ভূত আচার খায়?

খায়। আরো অনেক কিছু খায়। ব্যাটারি খায়। মধু খায়। তবে সলিড় কিছু খায় না। ব্যাটারির কার্বন দণ্ডটা খায় না।

আবু করিম আবার পড়া শুরু করলেন।

মানুষ মরলেই কি ভূত হয়? না-কি ভূত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রজাতি? মানুষদের যেমন জন্ম-মৃত্যু আছে, ভূতদেরও কি আছে? তারা কি বংশবৃদ্ধি করে?

মহামতি ডারউইন প্রমাণ করেছেন— selective evolution এর মাধ্যমে মানবজাতি পৃথিবীতে এসেছে। ভূতদের ক্ষেত্রে কি এই তথ্য সত্য?

মানুষের সঙ্গে ভূতের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভেদ? তারা কি আহার গ্রহণ করে? মানুষ যেমন রাজনীতি বিষয়ে আসক্ত তারাও কি তাই? তাদের মধ্যেও কি বিএনপি-আওয়ামী লীগ (কথা প্রসঙ্গে বলছি) আছে?

তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন? আমাদের যেমন উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদেরও কি আছে? তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি লালদল, নীলদল, শাদাদলে বিভক্ত? তাদের ছাত্ররাজনীতির অবস্থা কী?

মানুষদের যেমন মৃত্যু আছে, ভূতদেরও কি আছে? মৃত্যুর পর তারা কোথায় যায়? বিখ্যাত লেখক পরশুরামের একটি লেখায় পড়েছি— মৃত্যুর পর ভূতরা মার্বেল হয়ে যায়। পরশুরাম সাহেবের ভালো নাম রাজশেখর বসু, তিনি চলন্তিকা নামক ডিকশনারির প্রবক্তা। শিক্ষাগত জীবনে তিনি রসায়নশাস্ত্রে M.Sc. তার মতো একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব কীভাবে বলেন যে, মৃত্যুর পর ভূত মার্বেল হয়ে যায় তা আমার চিন্তার বাইরে।

যাই হোক, ভূত বিষয়ের সমস্ত প্রাপ্ত ধারণা দূর করার জন্যেই আমি লেখনি হাতে নিয়েছি। প্রথম মুদ্রণে কিছু তথ্যগত ভুল হয়তো থাকবে। দ্বিতীয় মুদ্রণে সমস্ত ভুলভ্রান্তি

দূর করা হবে।

আবু করিম খাতা বন্ধ করে বললেন, তোমার কাজের ছেলে রফিক ফিরে এসেছে বলেছিলে। সে কি আছে? না আবারো চুরি করে ভেগেছে?

সে এখনো আছে।

তাকে রাতে রান্না করতে বলবে। আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে ডিনার 4951

আচ্ছা।

ভালো কথা! তোমার ঐ কাজের ছেলে রফিক। সেও কি ভূত ভাইবোনকে দেখে? না-কি তুমি একাই দেখ?

রফিক ব্যাপারটা খেয়াল করছে না। হমডু ডমরুও চাচ্ছে না সবাই তাদের বিষয়টা জানুক। তবে তুমি যদি যাও অবশ্যই ওদের দেখবে। ওরা তোমার ভক্ত। তোমার বানানো আমিষ আচার খেয়েছে তো। তাছাড়া আমি ওদের তোমার কথা বলে রাখব।

আবু করিম বললেন, তোমার বিষয়ে আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছি। যাই হোক, আজ রাতেই সব ফয়সালা হবে। এখন বাসায় চলে যাও। আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় পিপীলিকা ক্রন্দন নিয়ে চিন্তা করতে দাও। গোটা পঞ্চাশেক পিঁপড়া পাওয়া গেলে সন্ধ্যার মধ্যে পিঁপড়া আচার

বানিয়ে ফেলতে পারতাম। পিঁপড়া আবার দুরকম লাল পিঁপড়া। কালো পিঁপড়া। কোন পিঁপড়ায় আচার ভালো হয় তাও বুঝতে পারছি না। ভালো দুঃশ্চিন্তায় পড়েছি।

সানাউল্লাহ রাতের খাবারের ভালো আয়োজন করলেন। আবু করিমের পছন্দ খিচুড়ি, বেগুন ভাজি। সঙ্গে খাটি ঘি দুই চামচ। তিনি নিরামিশাষি। খিচুড়ি, বেগুন ভাজি এবং ঘিয়ের ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে ডিমের ঝোল করা হলো। আবু করিম ডিম না খেলেও ডিমের ঝোল বা গরুর মাংসের ঝোল খান।

হমডুর সঙ্গে অতিথি প্রসঙ্গে আলাপ করলেন। তাকেও যথেষ্ট উৎসাহী মনে হলো। শুধু ডমরু বলল, বাবা, উনার সামনে যাব না। আমার লইজ্যা করে।

সানাউল্লাহ বললেন, লইজ্যা না মা। শব্দটা হচ্ছে লজ্জা। বলো লজ্জা করে।

বঁলব নাঁ। আমি বঁলব নাঁ।

সানাউল্লাহ বললেন, তোমরা যখন ভূতদের ভাষায় কথা বলবে তখন তোমাদের মতো বলবে। মানুষের ভাষায় কথা বললে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ করতে হবে। এবং নাকি উচ্চারণ করাই যাবে না। তোমার ভাই হমডুকে দেখ। সে তো নাকে কোনো কথাই বলে না।

হমডু বলল, যে বেড়াতে আসবে তাকে কী ডাকব?


সূচিপত্র

সানাউল্লাহ বললেন, স্যার ডাকবে। উনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং আচার উদ্ভাবক। আচার জগতের মুকুটহীন সম্রাট বললেও কম বলা হয়। এখন নতুন এক আচার বানানোর চেষ্টায় আছেন। শেষ পর্যন্ত যদি বানাতে পারেন হৈচৈ পড়ে যাবে। পিঁপড়ার আচার। নাম পিপীলিকা ক্রন্দন। আমাদের দেশে এই আচার চলবে না। তবে চায়নিজরা হামলে পড়বে। টনকে টন সাপ্লাই যাবে। ভালো কথা হমডু, চায়নায় ভূত আছে?

জানি না তো।

নাক চেপা কোনো চায়নিজ ভূতকে কখনো দেখ নি?

না।

সানাউল্লাহ বললেন, তোমরা বলতে পারবে না। তোমাদের বাবা-মা অবশ্যই পারবেন। তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। ভূপর্যটক ভূত থাকার কথা। হিউ-এনসাং টাইপ। হমডু, জামা-জুতা পরে রেডি হয়ে থাক। আমার বন্ধু ঘরে ঢুকামাত্র ভূতদের ভাষায় বলবে, ভূত সমাজের পক্ষ থেকে আমার সালাম গ্রহণ করুন। ভূতদের ভাষায় এটা কী হবে?

হমছু বলল, কিঁউইইই।

সানাউল্লাহ মুগ্ধ গলায় বললেন, এত বড় একটা সেনটেন্স এক শব্দে শেষ? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি আপনাকে দেখে বিরক্ত হয়েছি ভূত ভাষায় এটা কী হবে?

হমডু বলল, একটা ই কম হবে। কিঁউইই।

আপনাকে দেখে রাগ লাগছে— এর ভূত ভাষা কী?

হমড়ু বলল, আরেকটা ই কমে যাবে। কিঁউই।

সানাউল্লাহ বললেন, সবগুলি ই যদি ফেলে দেই। যদি বলি, কিঁউ তার মানে?

হমড়ু বলল, এর মানে বন্ধু।

সানাউল্লাহ বললেন, অসাধারণ। আমার বন্ধু ঘরে ঢুকামাত্র আমি বলব, কিঁউ। আর তুই বলবি, কিঁউইইই। সে শুরুতেই যাবে ভড়কে।

সানাউল্লাহ বন্ধুকে ভড়কাবার সুযোগ পেলেন না। রাত দশটায় আবু করিমের ড্রাইভার এসে বলল, স্যার অসিতে পারবেন না। তিনি মহাখালী কলেরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর বমি এবং দাস্ত হচ্ছে। পিঁপড়ার একটা আচার বানিয়েছিলেন। সেই আচার তরকারির চামচে এক চামচ খাবার পর থেকে এই অবস্থা। আমাকেও খেতে বলেছিলেন। আমি খেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে খাই নাই। স্যার, আমার উপর ময়মুরুব্বির দোয়া আছে।

সানাউল্লাহ বললেন, আমি এক্ষুনি বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছি। হমড়ুকেও সঙ্গে নেব। এই হমড়ু। রেডি হয়ে যাও।

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, কার সঙ্গে কথা বলেন স্যার?

সানাউল্লাহ বললেন, একটা ভূতের বাচ্চা বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়ে আছে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি তো কিছু দেখি না স্যার।

দেহধারণ করে না বলেই দেখছ না। দেহধারণ করলেই দেখবে। ভোমার সঙ্গে গাড়ি আছে না? আমাদের নিয়ে চলো।

ড্রাইভার বলল, আপনার হাসপাতালে যাওয়া ঠিক হবে না স্যার।

ঠিক হবে না কেন?

স্যারের অসুখের খবর পেয়ে শায়লা ম্যাডাম হাসপাতালে এসেছেন। তিনি রাতে থাকবেন। আপনাকে দেখলে শায়লা ম্যাডাম রাগারাগি করবেন। কারণ ম্যাডামের ধারণা আপনি স্যারকে পাগল বানিয়েছেন।

বলো কী?

জি। ম্যাডাম সবসময় এই কথা বলেন। তাছাড়া ম্যাডামের মন মেজাজ এখন। খুব খারাপ। সন্ত্রাসীরা তার চেম্বারে হামলা করেছিল। কাগজে উঠেছে, পড়েছেন

নিশ্চয়ই। স্যার, আমি যাই?

রাত অনেক হয়েছে। রফিক হিন্দি ছবি দেখছে। রফিকের পেছনে গা ঘেঁসে বসেছে হমডু এবং ডমরু। এরা দেহধারণ করে নি বলে রফিক তাদের দেখতে পাচ্ছে না। সানাউল্লাহ ভূতের লেখা নিয়ে বসেছেন। আজকের রচনার বিষয়—

ভূতের ভাষা। তিনি লিখছেন—

ভূতদের নিজস্ব ভাষা আছে। ব্যাকরণ আছে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাদের নিজেদের কোনো বর্ণমালা নেই। পৃথিবীর আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের মিল লক্ষণীয়। অনেক আদিবাসীদের ভাষা আছে, কিন্তু বর্ণমালা নেই। যেমন, আন্দামানের নিকবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী... জারোয়া, সেন্তেলিজ।

# ৬. ভূত-বিষয়ক রচনা

ডঃ আইনুদ্দিন গভীর মনোযোগে সানাউল্লাহর ভূত-বিষয়ক রচনা পড়ছেন। মাঝে মাঝে তার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। লেখা পড়ে বিরক্ত হচ্ছেন বলে যে এই ঘটনা ঘটেছে তা-না। তাঁর মন আজ অস্বাভাবিক খারাপ। স্ত্রীর সঙ্গে নাশতার টেবিলে একটা সমস্যা হয়েছে। নাশতার টেবিলে কেউ নিঃশব্দে নাশতা খায় না। দুএকটা কথা বলা ভুদ্রতারই অংশ। সেই হিসেবেই তিনি বললেন, একটা বিড়ালের গল্প শুনবে?

তাঁর স্ত্রী রুবা বলল, শুনব।

তিনি বললেন, অতি বিখ্যাত এক বিড়াল।

রুবা বলল, কী রকম বিখ্যাত? কথা বলতে পারে?

তিনি বললেন, কথা বলতে পারে না। সাধারণ বিড়াল। তবে এই বিড়াল একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত।

রুবা বলল, সেটা কীভাবে সম্ভব?

তিনি বললেন, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এটাকে সম্ভব করেছে। দাড়াও বুঝিয়ে বলছি। মনে কর আমি সেই বিড়াল। আমার প্লেটে যে ডিমের পোচটা আছে এটা ডিমের পোচ না। এটা হলো একটা রেডিও অ্যাকটিভ বস্তু। এবং তুমি হলে একজন অবজার্ভার। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অবজার্ভার নির্ভর। তুমি তাকিয়ে থাক বিড়ালটার দিকে।

তোমার কী মনে হয়— আমি জীবিত না মৃত? এই বলেই তিনি কয়েকবার ম্যাও ম্যাও করলেন।

রুবা নাশতার টেবিল থেকে উঠে গেল। ব্যাগ গুছিয়ে গাড়ি নিয়ে মায়ের বাড়ি চলে গেল। আইনুদ্দিন বিখ্যাত থট এক্সপেরিমেন্টটা ব্যাখ্যা করার সুযোগই পেলেন না। ঘটনা এখানেই শেষ না। ঘণ্টা দুই পরে তিনি তার শাশুড়ির টেলিফোন পেলেন। আইনুদ্দিনের শাশুড়ি সালেহা বেগম একসময় বাংলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁকে প্রমোশন না দিয়ে তাঁর জুনিয়র একজনকে প্রিন্সিপ্যাল করায় তিনি প্রতিবাদ হিসেবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের বাড়িতে প্রিন্সিপ্যাল ভাব এখন তাঁর অনেক বেশি। তিনি গম্ভীর গলায় গালি দেবার মতো করে বললেন, কেমন আছ বাবা?

জি ভালো।

তুমি কি আজ নাশতা খেতে বসে বিড়ালের মতো ম্যাঁও ম্যাঁও করছিলে?

জি।

কেন করছিলে জানতে পারি?

আম্মা! নাশতার টেবিলে আমি কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ ছিলাম না। আমি হয়ে গিয়েছিলাম শ্রোডিনজারের বিড়াল। যে জীবিতও না, আবার মৃতও না। অবজার্ভার ঠিক করবে সে জীবিত না-কি মৃত। আপনার মেয়ে রুবা ছিল অবজার্ভার। আম্মা, এখন কি আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?

পরিষ্কার হয় নি।

আরো খোলাসা করে বলি। এটা ছিল একটা থট এক্সপেরিমেন্ট। চিন্তা পরীক্ষা।

কী পরীক্ষা?

চিন্তা পরীক্ষা। পদার্থবিদ্যায় অনেক বিখ্যাত চিন্তা পরীক্ষা আছে। আপনাকে আরেকটা চিন্তা পরীক্ষার কথা বলি।

আমাকে কিছু বলতে হবে না বাবা। বরং তোমাকে আমি কিছু কথা বলি। তুমি ফিজিক্সের একটা মোটা বইয়ের ভেতর ঢুকে গেছ। সেই বই থেকে বের হতে পারছ না। আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারছে না, কারণ সে ফিজিক্স বা অংকের কোনো বই না। সে সাধারণ একজন মানুষ। বুঝতে পারছ?

পারছি।

আমার ধারণা বেশ কিছুদিন তোমাদের আলাদা থাকা উচিত।

জি আচ্ছা।

আমি তোমার সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর না নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার বাচ্চা মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মহা অন্যায় করেছি। তোমাদের বয়সের ব্যবধান বিশ বছর।

আইনুদ্দিন বললেন, আম্মা, আপনি ভুল করেছেন। ব্যবধান বিশ বছর না। উনিশ বছর পাঁচ মাস সাতদিন। আম্মা, কিছু মনে করবেন না। তথ্যগত ভুল আমার পছন্দ না।

সালেহা বেগম ‘প্রতিবন্ধি! ইডিয়েট!’ বলে টেলিফোন রেখে দিলেন।

আইনুদ্দিন শাশুড়ির বলা ইডিয়েট শব্দটায় কষ্ট পাচ্ছেন না। প্রতিবন্ধি শব্দটায় কষ্ট পাচ্ছেন। কারণ আর বাবা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করাবার সময় হেডমাস্টার সাহেবকে বলেছিলেন, স্যার, আমার ছেলেটাকে একটু দেখেশুনে রাখবেন। সে মানসিক প্রতিবন্ধি। তাঁর বাবা সেই বছরেই মারা গেলেন। তিনি দেখে যেতে পারলেন না তাঁর ছেলে প্রতিটা প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ফুল প্রফেসর বানিয়ে তাঁকে রেখে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিল, তিনি থাকেন নি। দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর দেশে ফেরার কারণও বিচিত্র। বর্ষাকালে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাক না শুনলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিদেশে এই জিনিষ সম্ভব নয়।

আইনুদ্দিন ভুত বিষয়ক লেখা পড়ে শেষ করে বললেন, হুঁ।

সানাউল্লাহ বললেন, হুঁ মানে কী?

আইনুদ্দিন বললেন, ইন্টারেস্টিং লেখা।

সানাউল্লাহ বললেন, ভূত আছে এটা কি সায়েন্স দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব?

আইনুদ্দিন বললেন, থট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যেতে পারে।

সানাউল্লাহ বললেন, একটা এক্সপেরিমেন্ট করো না। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ফিজিসিস্টের কাছে ভূত প্রমাণ করা কোনো বিষয়ই না।

আইনুদ্দিন বললেন, আমি চিন্তা শুরু করে দিয়েছি। কোন লাইনে এগুচ্ছি শুনতে চাও?

চাই।

ভূতকে শুরুতেই আমি পদার্থ হিসেবে ধরছি। এখন বলো পদার্থের অবস্থা কয়টা?

সানাউল্লাহ বললেন, তিনটা। কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

অইনুদ্দিন বললেন, পদার্থের অবস্থা ছয়টা। চতুর্থ অরস্থা হচ্ছে Plasma State. এই অবস্থায় পদার্থের সব পরমাণু একসঙ্গে চলে আসে এবং সব ইলেকট্রন মেঘের মতো পরমাণুর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে।

বলো কী!

প্লাজমা অবস্থা তৈরিতে প্রচুর তাপ লাগে। প্রায় এক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন। যাই হোক, পদার্থের অবস্থার নাম Bose-Einstein Condense পরম শূন্য তাপমাত্রায় পদার্থের এই অবস্থা হয়। পরম শূন্য অপমাত্রা কত জানো?

না।

আইনুদ্দিন বললেন, পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো মাইনাস ২৭৩ দশমিক এক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় কোনো বস্তুকে নিয়ে গেলে একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি হয়। অর্থাৎ সব পরমাণু একত্রিত হয়ে যায়। বেসি কণার ব্যাপারে ব্যাপারটা সহজে ঘটে। বোস কণা চেন?

আরে না। আমি এইসব চিনব কীভাবে?

বোস কণার কৌনিক ভরবেগ অর্থাৎ Intrinsic angular momentum হবে পূর্ণ সংখ্যা। বুঝতে পারছ?

সানাউল্লাহ কিছুই না বুঝে বললেন, জটিল বিষয়, কিন্তু অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আইনুদ্দিন বললেন, এখন বলি Fermion কণার কথা। এদের কৌণিক ভরবেগ হয় অর্ধপূর্ণ সংখ্যা। যেমন, ১/২ হতে পারে, ৩/২, হতে পারে, ৫/২ হতে পারে। পরিষ্কার না?

অবশ্যই পরিষ্কার। জলের মতো না হলেও পরিষ্কার।

আইনুদ্দিন বললেন, ফারমিওন কণা নিয়ে যখন সুপার অ্যাটম তৈরি হবে সেটি হবে পদার্থের ষষ্ঠ অবস্থা। এখন কী দেখলে? পদার্থের ছয়টা অবস্থা। ভূত পদার্থের অন্য এক অবস্থা তো হতে পারে। সপ্তম অবস্থা। হতে পারে না?

অবশ্যই পারে।

আইনুদ্দিন চিন্তিত গলায় বললেন, ভূতের কণার কৌণিক ভরবেগ হয়তো Boson বা Fermion-এর চেয়ে আলাদা। খুবই জটিল অবস্থা। তুমি চলে যাও, আমি চিন্তা করতে থাকি। তোমার ভাবি বাসায় না থাকায় চিন্তা করাটা আমার জন্যে সহজ হয়েছে। তুমি একটা কাজ কর। মোড়ের দোকান থেকে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা এনে রেখে যাও। তোমার ভাবি শুধু যে একা চলে গেছে তা-না। রহমতকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। উদ্দেশ্য আর কিছু না। আমাকে যন্ত্রণা দেয়া।

সানাউল্লাহ ফ্লাস্ক ভর্তি চা, পাউরুটি, কলা, বিসকিট, চানাচুর এবং দুটা সিদ্ধ ডিম আইনুদ্দিনের টেবিলে রেখে আবু করিমের সন্ধানে গেলেন। তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এই খবর পাওয়া গেছে।

আবু করিম সাহেব বাসায় নেই। তাঁর স্ত্রী ডা. শায়লা তাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে নিয়ে গেছেন। সাইকিয়াট্রিস্টের নাম ডা. জোহরা খানম। হেড মিসট্রেস টাইপ চেহারা। নাকের নিচে লাল চুলের গোঁফ আছে। তাঁর শরীর প্রকাণ্ড। মুখের হা প্রকাণ্ড। যখন হাই তুলেন তখন তাকে শাড়িপরা বাচ্চা হলহস্তির মতো দেখায়।

ডা. জোহরা খানম কয়েকটা কার্ড নিয়ে বসেছেন। কার্ডগুলিতে নানান ধরনের আঁকিবুকি কাটা। পেশেন্ট এইসব কার্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকাবে। তাকানোর পর কার্ডে কী আঁকা আছে বলে তার ধারণা তা সে বলবে। সেখান থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট পেশেন্টের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করবেন।

আবু করিম সাহেব।

জি।

ভালো আছেন?

জি।

আমি খুব সাধারণ একটা সাইকোলজিকেল টেস্ট দিয়ে শুরু করব। এই টেস্ট সম্পর্কে আপনি খুব ভালো জানেন। এই কার্ডটার দিকে তাকান। কার্ডে অস্পষ্ট কিছু ছবি আঁকা আছে। এই ছবিটা দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে? ছবিতে কী আঁকা?

আবু করিম দীর্ঘ সময় ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, চালতার আচার। ছোবা ছোবা হয়ে আছে। জ্বাল কম হয়েছে।

এখন বলুন এই ছবিটা কিসের?

আমের মিষ্টি আচার। কাশ্মিরী আচার নাম। যদিও এই ধরনের আচার কাশ্মিরে কখনো বানানো হয় না।

এখন এই ছবিটা দেখুন, এইটাও কি আচারের ছবি?

জি-না।

এটা কিসের ছবি?

হমড়ুর ছবি। হমড়ুর হাতে এক বোতল আমিষ আচার। তবে সে আমার সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। মজা পেয়েছে। মুখভর্তি হাসি।

হমড়ু কে?

হমড়ু হলো সানাউল্লাহর পোষা ভূতের বাচ্চা। সানাউল্লাহর সঙ্গেই থাকে।

সানাউল্লাহ সাহেব কি আপনার বন্ধু?

জি।

আচ্ছা কল্পনা করুন–আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সানাউল্লাহ সাহেব একটা নৌকায় করে যাচ্ছেন। আপনি একা সাঁতার জানেন, বাকি দুজন জানে না। হঠাৎ নৌকাডুবি হলো। আপনি যে-কোনো একজনকে বাঁচাতে পারেন। কাকে বাঁচাবেন?

নৌকায় কি কোনো আচারের বোতল আছে?

না।

সানাউল্লাহর সঙ্গে কি হমড়ু আছে?

না।

আবু করিম বললেন, আমি কাউকে বাঁচাব না। কারণ আমি সাঁতার জানি না। তবে আমার বন্ধু সানাউল্লাহ আমাকে বাঁচাবে। সে সাঁতার জানে এবং তার মাথা খারাপ হলেও সে লোক ভালো।

মাথা খারাপ বলছেন কেন?

যে ভূত পালে তাকে আপনি মাথা খারাপ বলবেন না?

ডা, জোহরা খানম বেশকিছু পরীক্ষা করলেন। এবং এক পর্যায়ে শায়লাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন— আপনার স্বামীর অবস্থা যথেষ্টই খারাপ। এখনো ভায়োলেন্ট হয় নি, তবে ভায়োলেন্ট হবার সব লক্ষণ পুরোদমে আছে। তাকে ঘরে আটকে রাখতে হবে। কখনোই বের হতে দেয়া যাবে না। নিয়মিত ওষুধ খাওয়াতে হবে। বেশির ভাগ সিডেটিভ। আমার একটা ক্লিনিক আছে। নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন— Hope, আমি সাজেস্ট করব এই মুহূর্তেই ক্লিনিকে ভর্তি করে দেয়া। কেবিন রুম আছে। এসি আছে। কষ্ট হবে না। এক মাস কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। বাইরে থেকে কোনো খাবার আসবে না। খাবার আমরা দেব। খরচ কিন্তু বেশি পড়বে আগেই বলে দিচ্ছি।

আবু করিমকে জোহরা খানমের Hope ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কেবিনের বেঙের সঙ্গে তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। হাতপা বাঁধা হবার

পর অল্পবয়েসি একটা নার্স সিরিঞ্জ নিয়ে ঢুকল ইনজেকশন দেবার জন্যে। তিনি বললেন, কী ইনজেকশন দিচ্ছ?

নার্স বলল, দাদু! কী ইনজেকশন দিচ্ছি সেটা তো আপনার জানার দরকার নেই।

আবু করিম বললেন, জানার দরকার আছে। আমি একজন ডাক্তার।

নার্স বলল, এখানে যারা ভর্তি হয় তারা সবাই এই ধরনের কথা বলে। কেউ ডাক্তার, কেউ মন্ত্রী, কেউ আবার মিলিটারির জেনারেল। ফিল্ড মার্শাল।

তুমি ডা. জোহরা খানমকে খবর দিয়ে আন। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

দাদু! উনি প্রয়োজন ছাড়া আসেন না। ইনজেকশন দিয়ে দিচ্ছি, টানা বারো ঘণ্টা ঘুমাবেন।

মা শোন, আমি সত্যি একজন ডাক্তার।

নার্স বলল, ডাক্তার দাদু! আরাম করে ঘুমান। ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন।

দাদু ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে?

আবু করিম টানা দশ ঘণ্টা ঘুমালেন। ঘুম ভাঙার এক ঘণ্টার মধ্যে আরেকটা ইনজেকশন দিয়ে আবারো তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো। হাত এবং পায়ের বাঁধন খোলা হলো না।

# ৭. ভূত বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত থিয়সফিস্ট

ভূত বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত থিয়সফিস্ট এবং মিডিয়ামের চেহারা খানিকটা ভূতের মতো। চোয়াল ভাঙা। দুই জুলফিতে সামান্য পাকা চুল ছাড়া মাথায় একটা চুলও নাই। মানুষের মাথা সচরাচর গোলকার হয় না। ইনারটা পারফেক্ট sphere। চোখ ইঁদুরের মতো পুঁতি পুঁতি। চোখের মণি স্থির না। মনে হয় সারাক্ষণ কিছু খুঁজছে। হয়তোবা ভূতই খুঁজছে। অতিরিক্ত রোগা একজন মানুষ। রোমান সিনেটারদের মতো গেরুয়া চাদর পরেছেন। ভদ্রলোকের নাম প্রফেসর টি আলি নরুন্দ।

তিনি কোনো কলেজের অধ্যাপক না। ম্যাজিশিয়াম এবং জোতিষীরা যেমন নামের আগে প্রফেসর লাগান ইনিও লাগিয়েছেন। নামের শেষের নরুন্দ কবি রবীন্দ্রনাথের দেয়। রবীন্দ্রনাথ একবার প্ল্যানচেটে এসে বললেন, আলি শোন, তুই নামের শেষে নরুন্দ লিখবি।

প্রফেসর টি আলি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নরুন্দ শব্দটার অর্থ কী গুরুদেব?

গুরুদেব বললেন, পরকালে আমার প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা। নরুন্দ শব্দটা কিছুদিন হলো তৈরি করেছি। এই শব্দ দিয়ে একটা গানও লিখেছি। দীর্ঘ তিন অন্তরার গান। প্রথম লাইন— গগনে গগনে নরুন্দের খেলা। নরুন্দ শব্দটার মানে দিয়েছি মেঘ। পরকালের শব্দ তো। ইহকালে তুমি ইচ্ছা করলে অন্য মানেও করতে পার।

প্রফেসর টি আলি নরুন্দ তার নামকরণের ইতিহাস বর্ণনা করে বললেন, এখন বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি? মৃত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে চান? কথা

বলিয়ে দেব। তবে টাটকা মরা হলে দ্রুত আত্মা নিয়ে আসব। দশ-বারো বছর হয়ে গেলে সমস্যা।

কাদের খান ভয়ে ভয়ে বললেন, কী সমস্যা?

আত্মা ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়। ডেকে আনতে কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে অনেকবার এনেছি তো, এখন ডাকলেই চলে আসেন। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। স্নেহ করেন বলেই নাম দিয়েছেন নরুন্দ। কবিগুরুর স্নেহ পাব কখনো ভাবি নি।

সানাউল্লাহ বললেন, আমরা আসলে কোনো আত্মার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি না। ভূত-প্রেত বিষয়ে জানতে এসেছি। ভূত নিয়ে একটা বই লিখছি বলেই জানতে চাচ্ছি। শুনেছি এই বিষয়ে আপনার অগাধ জ্ঞান।

নরুন্দ বললেন, অল্পকিছু জানি। অহঙ্কার করার মতো কিছু না। আইনস্টাইনের মতো বলতে হয়–আমি জ্ঞানসমুদ্রে নুড়ি কুড়াচ্ছি।

সানাউল্লাহ বললেন, স্যার, কিছু মনে করবেন না। কথাটা বিজ্ঞানী নিউটনের।

নরুন্দ কঠিন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কথাটা আমি সরাসরি আইনস্টাইনের কাছে শুনেছি। প্রায়ই চক্রে উনাকে আহ্বান করা হয়। উনার কাছ থেকে পদার্থবিদ্যার নানান কথা শুনি। পরকালেও গবেষণার মধ্যে আছেন। তবে বেচারা অত্যন্ত লজ্জিত।

কাদের খান বললেন, লজ্জিত কেন?



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটিতে তিনি কিছু ভুল করেছেন। এই ভুলটা পৃথিবীর পদার্থবিদরা ধরতে পারছেন না বলেই লজ্জিত। ভুলটার কারণেই ডার্ক ম্যাটার নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছে। আইনস্টাইন স্যারের কাছ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত জ্ঞানের কথা শুনি। এত ভালো লাগে।

কাদের খান বললেন, একটা জ্ঞানের কথা আমাদের বলুন। প্লিজ।

নরুদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ইহকালে আলোর গতি ধ্রুব। সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। কিন্তু পরকালে আলোর গতি ধ্রুব না। যে যার ইচ্ছামতো আলোর গতি ঠিক করতে পারে। এই কারণে পরকাল হচ্ছে আলোরই খেলা। আপনারা চা খাবেন?

সানাউল্লাহ বললেন, চা খাব না। ভূত বিষয়ে যদি কিছু বলেন। অনেক দূর থেকে এসেছি।

নরুন্দ বললেন, চার-পাঁচ মিনিটে তো কিছুই বলতে পারব না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে হবে। এত সময় আমার নেই। আপনাদেরও নিশ্চয়ই নেই।

সানাউল্লাহ বললেন, আমাদের সময়ের সমস্যা নেই। আপনার সমস্যাটাই প্রধান।

বেসিক জিনিসগুলি আজ বলে দিচ্ছি। আরেকদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে আসবেন, আপনাদের চক্রে ঢুকিয়ে দেব। সরাসরি আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

কাদের খান বলল, স্যার, আপনি যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন সেদিনই চলে আসব।

নরুন্দ বললেন, চক্রে বসার ফি বাবদ আমি পার পারসন দুই হাজার করে টাকা নেই। আগেভাগেই বলে দিলাম।

কাদের খান বললেন, বলে ভালো করেছেন স্যার। আমি একটু টানাটানির মধ্যে আছি। সানাউল্লাহ স্যার বসবেন। এইসব বিষয় উনারই বেশি জানা দরকার।

নরুন্দ ভূত-পরকাল বিষয়ে যা বললেন তা হচ্ছে— আত্মা বা soul অবিনশ্বর। আত্মারাই ঘুরাফেরা করেন। তাদেরকে আমরা ভূত বলে ভুল করি। ভূত হচ্ছে পরকালের জীবজন্তু। এদের জন্ম-মৃত্যু আছে।

সানাউল্লাহ বললেন, আমরা যেমন মৃত্যুর পর পরকালে যাচ্ছি। ভূতরা কোথায় যায়?

নরুন্দ বললেন, ওদের জন্যে আলাদা পরকাল আছে। সেই পরকাল হচ্ছে শুদ্ধতা শিক্ষার আবাস। সেখানে তারা শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হবার পর তারা মানুষ টাইটেল পায়। পুরোপুরি মানুষ হওয়া অবশ্যি তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা হয় ভূ-মানুষ। অর্থাৎ ভূত মানুষ। তাদের একজনকে আমি চক্রে আহ্বান করেছিলাম। অত্যন্ত ফ্রাস্টেটেড তার কথাবার্তা।

কাদের খান বললেন, স্যার, একটু পরিষ্কার করে যদি বলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।

নন্দ বললেন, পাঁচ মিনিট কথা বলেই সব বুঝে ফেলতে চান? তা-কি হয়? আমি বৎসরের পর বৎসর এই বিষয় নিয়ে কাজ করে সামান্য একটা নুড়ি কুড়িয়ে পেয়েছি।

সানাউল্লাহ বললেন, স্যার, বিদায় দেন। যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি।

নরুন্দ বললেন, আমার আধাঘণ্টা সময় নিয়েছেন। তার ফি বাবদ দুজনের পাঁচশ টাকা হয়। আপনারা চারশ টাকা দিন। আপনাদের জন্যে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিলাম। ভূত নিয়ে বই লিখছেন বলেই এই ডিসকাউন্ট।

সানাউল্লাহ পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করে বললেন, স্যার, পুরোটাই রেখে দিন।

নরুন্দ টাকা পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আপনি আগামী বুধবার চলে আসুন। চক্রে বসিয়ে দেব। ঐদিন কবিগুরুকে ডাকব। প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে একটা নামও নিতে পারেন।

কাদের খান রাস্তায় নেমেই বলল, বিরাট ফ্রড়। কী বলেন স্যার?

সানাউল্লাহ বললেন, চট করে কাউকে ফ্রড বলা ঠিক না। ভেতরে জিনিস আছে, আমরা বুঝতে পারছি না। আলোর গতি নিয়ে উনি যে কথাটা বললেন, তা শুদ্ধ জ্ঞানের কথা। চক্রে এসে দেখি কী হয়।

দুই হাজার টাকা খামাখা নষ্ট করবেন?

সানাউল্লাহ বললেন, নষ্ট নাও তো হতে পারে। সবকিছু নিগেটিভ ভাবে চিন্তা করা ঠিক না।

রাত বেশি হয় নি। আটটা বাজে। সানাউল্লাহ কাদের খানকে নিয়ে Hope ক্লিনিকে গেলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। সানাউল্লাহর অস্থির লাগছে। এর আগেও তিনি দুবার Hope ক্লিনিকে এসেছেন। দেখা হয় নি। আজ আরেকবার চেষ্টা নেবেন। রোগীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবে না— এটা কেমন কথা! বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে বরং রোগীর মন প্রফুল্ল হবে।

আজও দেখা হলো না। রিসিপশনে বসে অবিকল চামচিকার মতো মেয়েটি বলল, পেশেন্ট ঘুমাচ্ছে।

সানাউল্লাহ বললেন, মাত্র আটটা বাজে, এর মধ্যে পেশেন্ট ঘুমাচ্ছে?

রিসিপশনিস্ট বলল, আমাদের এখানকার নিয়ম হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার দেয়া হয়। সাড়ে সাতটার মধ্যে পেশেন্টকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়। মেন্টাল পেশেন্টের জন্যে ঘুমটাই একমাত্র চিকিৎসা।

কাদের খান বলল, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না ম্যাডাম। হয়তো জেগে আছেন।

রিসিপশনেস্ট বলল, প্রথম কথা পেশেন্ট ঘুমুচ্ছে। দ্বিতীয় কথা জেগে থাকলেও দেখা করতে দেয়া হবে না। আমরা পেশেন্টকে solation-এ রাখি। উনাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেই দেখা করতে দেয়া হয় না। আপনারা তো অনেক দূরের।

সানাউল্লাহ বললেন, আমি দূরের কেউ না। আমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পাগলের আবার বন্ধু কী? পাগলের কাছে সবাই বন্ধু আবার সবাই শত্রু, বুঝেছেন? এখন বিদায় হোন।

আবু করিম জেগে আছেন। এখন তিনি বাঁধা অবস্থায় নেই। বিছানায় পা ঝুলিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বসে আছেন। ঘুমের ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে তার মধ্যে জবুথবু ভাব চলে এসেছে। তিনি হতাশ চোখে নার্সের দিকে তাকিয়ে আছেন। নার্স সিরিঞ্জে ওষুধ ভরছে।

আবু করিম বললেন, ইনজেকশনটা দুটা মিনিট পরে দাও। দুটা মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলি।

নার্স বলল, দুই মিনিট প্রেম করতে চান?

আবু করিম বললেন, প্রথম দিনেই তোমাকে মা বলে ডেকেছিলাম। তুমি মনে হয় ভুলে গেছ।

মার্স বলল, দুই মিনিট সময় দেয়া যাবে না। এক মিনিট দিলাম। বলুন কী বলবেন?

আবু করিম বললেন, আমি আমার বন্ধু সানাউল্লাহকে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছি— যে তোমাকে এই চিঠিটা দেবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে নগদ দশ হাজার টাকা দেবে। আমার বন্ধু টাকাটা অবশ্যই দেবে। এখন মা বলো, তুমি কি চিঠিটা তাকে পৌঁছে দিয়ে দশ হাজার টাকা রোজগার করতে চাও? আমার বালিশের নিচে চিঠিটা আছে।

নার্স বলল, আপনার এক মিনিট শেষ। হাত বাড়ান, ইনজেকশন দেব।

হতাশ আবু করিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হাত বাড়ালেন।

আইনুদ্দিনকে Hope ক্লিনিকে ভর্তি করার ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করা হয়েছে। আইনুদ্দিনের শাশুড়ি মেয়ে রুবাকে নিয়ে কাজটা করেছেন। ডা. জোহরা খানম ফিজিক্সের ছাত্রী সেজে গোপনে দেখেও গেছেন। তিনি বলেছেন, পেশেন্টের কথাবার্তা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও পেশেন্ট সিঙ্গেল ট্রেক হয়ে গেছে। যে-কোনো মুহূর্তে ট্রেকচ্যুত হবে। তখনি ভায়োলেন্ট হয়ে যাবে। ট্রেকচ্যুত হবার আগেই তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা দরকার। আপনারা ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনো রকমে তাঁকে ক্লিনিকের গেট পর্যন্ত আনুন। বাকিটা আমার লোকজন করবে।

আইনুদ্দিনের স্ত্রী এবং শাশুড়ি আজ এই উদ্দেশ্যেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন। বেড়াতে যাবার কথা বলে আইনুদ্দিনকে গাড়িতে তোলা হবে। আইনুদ্দিন রাজি হয়েছেন। তিনি বলেছেন একটা জটিল অঙ্ক করছেন। অঙ্ক শেষ হলেই গাড়িতে

সালেহা বেগম বললেন, বাবা, এটা কী অঙ্ক এত সময় লাগছে।

আইনুদ্দিন বললেন, ভূত বিষয়ক একটা অঙ্ক।

ভূতের অঙ্ক?

জি। বিষয়টা হচ্ছে–আমি ভূতের একটা কাল্পনিক সমীকরণ দাঁড় করিয়েছি।

ভূত কণার কৌণিক ভরবেগ হিসাবে Fermion কণা নিয়েছি। তবে তার সঙ্গে একটি ইমাজিনারি নাম্বার বসিয়ে দিয়েছিঅর্থাৎ স্কয়ার রুট অব মাইনাস ওয়ান। যেহেতু ভূত একটি ইমাজিনারি বিষয়, ইমাজিনারি নাম্বারটা আসা উচিত।

সালেহা বেগম মেয়ের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। রুবা বলল, তোমার এই ভূতের অঙ্ক শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?

আইনুদ্দিন বললেন, বুঝতে পারছি না।

রুবা বলল, এক ঘণ্টার জন্যে অংকটা বন্ধ রাখ। আমরা এর মধ্যে ঘুরে চলে আসব।

আইনুদ্দিন বললেন, কোথায় যাব?

সালেহা বেগম বললেন, একটু আগে কী বললাম? আমার এক পরিচিত রোগী হোপ ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে। তাকে দেখে আসব।

আইনুদ্দিন বললেন, আমি তাকে জবেকীকরব। আমি তো ডাক্তার না।

রুবা বলল, কেউঅসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া হলো সামাজিক। তুমি রাজি হয়েছিলে যাবে, এখন গাঁই গুই করছ কেন?

অঙ্ক করছি তো।

তোমার অঙ্ক পালিয়ে যাচ্ছে না। একঘণ্টার মধ্যে আবার শুরু করতে পারবে।

আইনুদ্দিন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

সালেহা বেগম বললেন, বরং একটা কাজ কর, তোমার খাতা কলম সাথে নিয়ে দাওন। গাড়িতে যেতে যেতে ভূতের অঙ্ক করবে। এই বলেই তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলেন।

অইনুদ্দিন খাতা এবং কলম নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর হঠাৎ করে মনে হলো—প্রকৃতি জটিলতা পছন্দ করে না। তিনি অকারণেই সমীকরণ জটিল করেছেন। ভূতের কণা হওয়া উচিত Boson কণা। নতুন এই বিষয় মাথায় নিয়ে হাসপাতালে যাবার প্রশ্নই ওঠে। তিনি বলেন, একটা মিনিট সময় চাই বাথরুমে যাব।

সালেহা বেগম দরাজ গলায় বললেন, এক মিনিট কেন? যতক্ষণ লাগে সময় নাও। ভালোমতো হাতমুখ ধুয়ে নিও। ভূতের ভঙ্ক করতে করতে তোমাকে দেখাচ্ছেও ভূতের মতো।

আইনুদ্দিন বাথরুমে না ঢুকে পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। তাঁর গন্তব্য সানাউল্লাহর বাড়ি। তিনি ঠিক করেছেন অঙ্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন।

সালেহা বেগম হেপি ক্লিনিকে জোহরা খানমকে টেলিফোন করে জানালেন, রোগী নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হচ্ছি। রোগী এখন বাথরুমে। বাথরুম থেকে বের হলেই রওনা হবো। গাড়ি রেডি আছে। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। এখন সে ভূতের অঙ্ক করছে।

জোহরা খানম বললেন, কোনোরকমে ক্লিনিকে নিয়ে আসুন। ভূতের অঙ্ক চিরজীবনের মতো ভুলিয়ে দেব।

রাত এগারোটায় আইনুদ্দিন অনেক ঝামেলা করে সানাউল্লাহর বাড়ি খুঁজে পেলেন। আইনুদ্দিনের চেহারা উদ্ভ্রান্ত। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন সানাউল্লাহর বাড়ি খুঁজে পাবেন না। বাকি জীবন তাঁকে রিকশায় বসে কাটাতে হবে। এটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে রিকশা ভাড়া। তিনি শূন্য পকেটে বের হয়েছেন।

# ৮. তিনদিন হলো আইনুদ্দিন মহানন্দে

তিনদিন হলো আইনুদ্দিন মহানন্দে সানাউল্লাহর বাড়িতে বাস করছেন। তাঁকে আলাদা একটা ঘর দেয়া হয়েছে। চেয়ার-টেবিল দেয়া হয়েছে। নীলক্ষেত থেকে বিশাল সাইজের কোলবালিশ কিনে আনা হয়েছে। দিনের মধ্যে কয়েকবার কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে থাকা তার অভ্যাস। আইনুদ্দিনের রুটিন এরকম—

সকাল ছটা : ঘুম থেকে জেগে উঠেন। এক কাপ লিকার চা খেয়ে এবং Physics in trouble বইটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকেন। সকাল সাতটা; নাশতা খেয়েই লেখার টেবিলে। অংক কষার শুরু।

সকাল দশটা। : অংকে বিরতি। কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে থাকা।

সকাল এগারোটা : আবার অংক শুরু।

দুপুর একটা : লাঞ্চ শেষ করে কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুম।

দুপুর তিনটা : কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে থাকা।

সন্ধ্যা ছটা : অংক শুরু।

রাত এগারোটা : রাতের খাবার এবং এক ঘুমে রাত কাবার।

সানাউল্লাহর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় না বললেই ঠিক বলা হয়। রফিক এই মানুষটাকে দেখে মুগ্ধ। সে এসে সানাউল্লাহকে বলল, বিরাট পাগল আদমি স্যার।

সানাউল্লাহ বললেন, কী করে বুঝলি পাগল আদমি?

রফিক বলল, প্রথম রাইতেই বলেছি স্যার আমার নাম রফিক। কিছু যদি লাগে রফিক বইল্যা আওয়াজ দিলে দুইটা আসব। সকালবেলা জিগ্যাস করে— এই তোমার নাম কী? নাম বললাম। সইন্ধ্যাবেলা আবার জিগায়, এই তোমার নাম কী? দিনের মধ্যে কয়েকবার উনারে নাম বলতে হয়।

সানাউল্লাহ বললেন, অতিরিক্ত জ্ঞানের মানুষ তো, এইজন্যে এরকম।

রফিক বলল, খাওয়া খাদ্য নিয়াও উনার কোনো চিন্তা নাই। যা দিতেছি খাইয়া ফেলতেছে। লবণ ছাড়া একবার তরকারি রাইন্ধা দিলাম। আপনেরে আলাদা লবণ দিয়া দিছি। উনারে লবণের একটা দানাও দেই নাই। খাইয়া ফেলছে। কিছু বুঝে নাই।

এরকম আর করবি না। যত্ন করবি।

অবশ্যই যত্ন করব স্যার। জ্ঞানী মানুষের যত্ন না করলে কার যত্ন করব? মূখের যত্ন? বাপ-মা আমারে এইজন্যে পয়দা করে নাই।

সানাউল্লাহ ভেবেছিলেন হমডু-ডমরুর সঙ্গে আইনুদ্দিনের পরিচয় করিয়ে দেবেন। শেষে পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন। ভূতের বাচ্চা দেখে মানুষটা ঘাবড়ে যেতে পারে। জটিল অংক নিয়ে বসেছে। শেষে অংকে গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

হমডু-ডমরুকে আইনুদ্দিনের কথা বলেছেন। তারাও আড়াল থেকে দেখে এসেছে। তারা আইনুদ্দিনের নাম দিয়েছে অংক চাচু।

সানাউল্লাহ এখন নিয়ম করে তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। যুক্তাক্ষর ছাড়া বাংলা শব্দ দুজনই পড়তে পারে! হমডু যোগ-বিয়োগ শিখে ফেলেছে। ডমরু মনে হচ্ছে অংকে একটু কাঁচা। লেখাপড়া সানাউল্লাহ খুব কায়দা করে শেখাচ্ছেন। রফিককেও সঙ্গে নিয়ে বসছেন। তিনজন একসঙ্গে শিখছে। কাজেই রফিক কিছু বুঝতে পারছে না। হমডু ডমরু রফিকের আশেপাশেই ঘুরঘুর করে কিন্তু রফিক তাদের দেখতে পায় না। অথচ তিনি নিজে স্পষ্ট দেখছেন। মাঝে মাঝে তার নিজের ক্ষীণ সন্দেহ হয়। হমডু ডমরু তাঁর মনের কল্পনা না তো? পরমুহূর্তেই এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেন। মনের কল্পনা হলে রোজ যে ব্যাটারি কিনে আনছেন, সেই ব্যাটারিগুলি খাচ্ছে কে?

হমডু ডমরুর ওপর তার অস্বাভাবিক মায়া পড়ে গেছে। এখন তারা আর খাটের নিচে ঘুমায় না। সানাউল্লাহর সঙ্গে খাটেই ঘুমায়। সানাউল্লাহকে রাতে গল্প শুনাতে হয়। সানাউল্লাহ ঠাকুরমার ঝুলি বইটা কিনে এনেছেন। রোজ রাতে বই থেকে দশ পাতা পড়ে শুনাতে হয়। তিনি চেষ্টা করছেন দুই ভাইবোনের রাতে জেগে থাকার অভ্যাস দূর করতে। মানুষের সঙ্গে তারা যেহেতু বাস করছে তাদের মানুষের স্বভাব গ্রহণ করাই ভালো। ডমরু

এখন রাতে ঘুমানো অভ্যাস করে ফেলছে। হমড়ু ঘুমাচ্ছে না, তবে হাইতোলা শুরু করেছে। মনে হয় কিছুদিন পর সে নিজেও ঘুমাতে শুরু করবে।

সানাউল্লাহ ভূত সমাজের জন্যে কিছু করতে চান। প্রাণী হিসেবে মানুষের অবস্থান ভূতের ওপরে। ওপরের অবস্থানের প্রাণী দুর্বলদের জন্যে কিছু করবে সেটাই স্বাভাবিক। ভূতদের জন্যে তিনি কী করবেন তা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন—

ক, বাসস্থান সমস্যার সমাধান। যেসব গাছে ভূতরা থাকতে চায় সেইসব গাছ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো। যেমন, শ্যাওড়া গাছ, তেঁতুল গাছ, বেল গাছ, বাঁশঝাড়। অনাথ ভূতশিশু কিংবা পিতামাতা পরিত্যক্ত ভূত শিশুদের জন্যে একটা এতিমখানা প্রতিষ্ঠা।

খ. ভূতদের আদমশুমারি অর্থাৎ ভূত শুমারি করা। যাতে বাংলাদেশে ভূতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়।

গ. ভূত খাদ্য। ভূতরা ঠিকমতো খাদ্য খাচ্ছে কি-না সেটাও লক্ষ রাখতে হবে। খাদ্যের অভাবে এরা যেন কষ্ট না পায়।

ঘ. তাদের শিক্ষার দিকটাও দেখতে হবে। মানুষরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এতদূর এগিয়েছে, ভূতরা শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে থাকবে, এটা কেমন কথা!

সানাউল্লাহ একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যেসব ভূত ঢাকা শহরে বাস করে, তাদের নগরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার আছে। এই বিষয়টাই উনাকে বুঝিয়ে বলা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ঢাকা শহরে আপনি শ্যাওড়া গাছ আর বাশ গাছ লাগাতে চান?

সানাউল্লাহ বললেন, জি জনাব। নিজ খরচে করব, এতে বাসস্থান সমস্যার আশু সমাধান হবে।

কার বাসস্থান?

ভূতদের বাসস্থান। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তো হবে না। ওদের সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেখতে হবে। তারা আমাদের মতোই ঢাকা শহরে বাস করছে। যদিও মিউনিসিপ্যালটি Tax দিচ্ছে না। প্রয়োজনে দিবে।

আপনি কি সত্যি সত্যি ভূতদের জন্যে শ্যাওড়া গাছ লাগাতে চাচ্ছেন?

জি জনাব। আমি পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করে মেয়র সাহেবের কাছে একটা আর্জিনামা লিখে এনেছি।

আর্জিনামা রেখে যান, আমি মেয়র সাহেবের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব।

সানাউল্লাহ বললেন, আপনার অশেষ মেহেরবানি। ভূত সমাজের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ভাই যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কিন্তু ভালো চিকিৎসা দরকার।

সানাউল্লাহ বললেন, আমার মেয়ে জাবিনেরও তাই ধারণা। সে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনে অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসা নেব। মেয়ে দেখবে।

মেয়ের কাছে থাকুন, ভালো থাকবেন। ভূতদের নিয়ে ভূতরা চিন্তা করুক। তাই না? আরেকটা কথা, ভূতদের প্রতি আপনার এত মমতা, আপনি নিজে কি কখনো ভূত দেখেছেন?

সানাউল্লাহ বললেন, ভূতের দুই বাচ্চা আমার সঙ্গেই থাকে। এরা ভাইবোন। বোনটা আমাকে বাবা ডাকে। এই তথ্যটা আপনাকে প্রথম জানালাম। আর কেউ জানে না। আমার মেয়ে জাবিনকেও বলি নি। একটা ভূতের বাচ্চা আমাকে বাবা ডাকছে— এটা জানলে সে মনে কষ্ট পেতে পারে।

চা খাবেন?

সানাউল্লাহ বললেন, চা খাব না ভাই। আপনি যে চা খাওয়াতে চেয়েছেন এটাই যথেষ্ট। অফিস-আদালতে এই কাজটা আজকাল কেউ করে না। সবাই আছে নিজের ধান্ধায়। সবাই দেখছে নিজের স্বার্থ। আমার মেয়ে আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সে দেখছে নিজের স্বার্থ। সে একবারও চিন্তা করছে না ভূতের বাচ্চা দুটার কী হবে? এদের কার কাছে রেখে যাব?

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, এদের আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভূতের দুই বাচ্চার ভিসাও লাগবে না। টিকিটও লাগবে না।

সানাউল্লাহ আনন্দিত গলায় বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন ভাই সাহেব। আমার মাথায় বিষয়টা একবারও আসে নি। আপনার এখানে আসা আমার সার্থক হয়েছে।

যদি সময় পান অষ্ট্রেলিয়া যাবার আগে একবার আসবেন।

অবশ্যই আসব।

সবচেয়ে ভালো হয় আমার বাসায় যদি একবার আসেন। আপনার নিজের মুখ থেকে পোষা ভূতের গল্প শুনলে আমার ছেলেমেয়েরা মজা পাবে। ওরা আমার কাছে রোজ রাতে ভূতের গল্প শুনতে চায়। আমি কোনো ভূতের গল্প জানি না বলে বলতে পারি না।

কবে যেতে বলছেন?

দেরি করে লাভ কী! আজই চলে আসুন। আমি ধানমণ্ডিতে থাকি।

সানাউল্লাহ বললেন, ভাই, আজ তো যেতে পারব না। আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে আনা হবে। চক্রের মাধ্যমে আনা হবে। নরুন্দ সাহেব ব্যবস্থা করছেন। উনি থিয়সফিস্ট বিখ্যাত মিডিয়াম।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার ড্রয়ার থেকে তার একটা কার্ড বের করে দিতে দিতে বললেন, কার্ডটা রেখে দিন। ঠিকানা লেখা আছে। যে-কোনো সন্ধ্যায় টেলিফোন করে বাসায় চলে আসবেন।

আমার ছেলেমেয়েরা আপনার ভূতের বাচ্চার গল্প শুনবে। রবীন্দ্রনাথের আত্মার সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্পও শুনবে।

নরুন্দ সাহেবের বাড়িতে ভৌতিক চক্র বসেছে। একটা গোল টেবিলের চারপাশে হাত ধরাধরি করে পাঁচজন বসা। সবার হাত টেবিলে রাখা। টেবিলের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে। এছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। নন্দের গলায় বেলিফুলের মালা। মোমবাতির নিচেও কিছু টাটকা বেলিফুল রাখা হয়েছে। বেলি ফুলের কোনো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের এক কোনায় ধূপ পোড়ানো হয়েছে। ঘরভর্তি ধুপের গন্ধ। নন্দ কথা বলা শুরু করলেন—

ভৌতিক চক্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখানে যারা আছেন, তারা একাধিকবার চক্রে বসেছেন। আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নতুন সদস্য জনাব সানাউল্লাহ। তিনি একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার। তার সঙ্গে কথাবার্তা থেকে কিছুক্ষণ আগে জেনেছি তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করছেন তার নাম দিনের শেষে ভূতের দেশে। এই নামটি কবিগুরুর গান থেকে ধার করা। আজ আমরা কবিগুরুকে চক্রে আহ্বান করব।

আপনারা সবাই চোখ বন্ধ করে এক মনে বলবেন, গুরুদেব আসুন। আমরা আপনার প্রতীক্ষায়। কেউ হাত ছাড়বেন না। আমরা হাতে হাত ধরে গেলি করে বসেছি। এই কারণে একটি চৌম্বক আবেশের তৈরি হয়েছে। যখন আবেশ জোরালো হবে তখন চৌম্বক ঝড় পরকালে ধাক্কা দেবে। কবিগুরু আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে আসবেন।

সানাউল্লাহ আশ্চর্য হয়ে বললেন, উনাকে কি চোখের সামনে দেখব?

নরুন্দ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সানাউল্লাহর দিকে তাকালেন। নরুন্দের অ্যাসিসটেন্ট আসগর মিয়া নরুন্দের ডানদিকে বসেছেন। কাকলাসের মতো চেহারা। নাকের নিচে বিরাট গোঁফ। গোফটা এমন যে মনে হয় গাম দিয়ে লাগানো। কথা বললেই খুলে পড়ে যাবে। আসগর মিয়া বললেন, রবীন্দ্রনাথের আত্মা স্যারের উপর ভর করবে। তখন রবীন্দ্রনাথের হয়ে স্যরি কথা বলবেন। স্যারের উপর ভর করার একটাই কারণ— স্যারের মতো মিডিয়াম অতি দুর্লভ।

নরুন্দ বললেন, অতি উচ্চশ্রেণীর ভৌতিক চক্রে অবশ্যি চর্মচক্ষেও আত্মা দেখা যায়। আমার কয়েকবার সেই সৌভাগ্য হয়েছে। শেকসপিয়র সাহেবকে দেখেছি। তার সঙ্গে হ্যান্ডশেকও করেছি। সেই গল্প আরেকদিন করব। যাই হোক, আপনারা আহ্বান শুরু করুন। আত্মার অবির্ভাবের পর তাকে প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন করবেন বিনয় এবং ভদ্রতার সঙ্গে। সবার চোখ বন্ধ। বলুন, গুরুদেব আসুন। আমরা আপনার প্রতীক্ষায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরুন্দর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি ঘনঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। মাথা পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল। আসগর মিয়া বললেন, গুরুদেব চলে এসেছেন। সবাই বলুন, সুস্বাগতম।

সবাই বলল, সুস্বাগতম।

নরুন্দ চোখ মেলে সবার দিকে তাকালেন এবং খানিকটা মেয়েলি গলায় বললেন, তোমরা ভালো আছ? বলেই তাকালেন সানাউল্লাহর দিকে।

সানাউল্লাহ ভীত গলায় বললেন, স্যার আমি ভালো আছি। অন্যদের কথা বলতে পারছি না। আপনি কেমন আছেন?

নরুন্দ (অর্থাৎ কবিগুরু) বললেন, আমি অনিত্য। জগৎ অনিত্য। আমি এই অনিত্যের মাঝেই নিত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছি।

এখনো কি কবিতা রচনা করেন?

আমি যেখানে বাস করি সেখানে কাগজও নেই কলমও নেই। তারপরেও মনে মনে কাব্য রচনা করি। অবসরে নিজের লেখা পুরনো কবিতাগুলি আবৃত্তি করি–

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো, দুই ফোঁটা দিলেম শিশির।

সানাউল্লাহ বিঘ্নিত হয়ে বললেন, নিজের কবিতা ভুল করেছেন স্যার। দুই ফোঁটা শিশির হবে না স্যার। হবে একফোঁটা শিশির।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, মর্তে আমি একফোঁটা শিশিরের কথাই লিখেছিলাম। পরকালে এসে মনে হলো আমাকে এই কৃপণতা মানায় না। শিশির দুই ফোঁটা হওয়া উচিত। কাজেই কারেকশন করেছি।

কথা শেষ হবার আগেই নরুন্দ গো গো শব্দ করতে করতে ধড়াম করে টেবিলে পড়ে গেলেন। আসগর মিয়া বললেন, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। গুরুদেব চলে গেছেন।

আজকের মতো চক্রের সমাপ্তি। সবাই যার যার বাড়িতে চলে যান। আমার স্যার অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাকে মেডিকেলে নিতে হতে পারে।

সানাউল্লাহ বন্ধুকে নিয়ে রাতের খাওয়া খেতে বসেছেন। আইনুদ্দিনকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। বেচারা অংক নিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন বুঝাই যাচ্ছে। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে।

সানাউল্লাহ বললেন, অঙ্ক কোন পর্যায়ে আছে? আইনুদ্দিন বললেন, একটা wave function দাড় করিয়ে ফেলেছি।

তাহলে তো মনে হয় অনেকদূর চলে গেছ।

আইনুদ্দিন চিন্তিত গলায় বললেন, তা না। জিনিস আরো জটিল হচ্ছে।

সানাউল্লাহ বললেন, রুবা ভাবি অস্থির হয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তুমি যে আমার এখানে আছ তা জানাব?

ভুলেও না। এখানে আমি ভালো আছি। শুধু খাবারদাবারে মাঝে মধ্যে সামান্য সমস্যা হচ্ছে।

কী সমস্যা? তোমার কাজের ছেলে, ওর নাম যেন কী? রফিক।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আইনুদ্দিন বললেন, রফিক ছেলেটা রান্নাবান্নায় বিশেষ পারদর্শী বলে মনে হচ্ছে না। প্রায়ই লবণ ছাড়া তরকারি রাধছে। তুমি আলাভোলা মানুষ বলে বুঝতে পারছ না। একদিন সকালে আমাকে চিনির বদলে লবণ দিয়ে চা দিল।

ওকে কিছু বলো না কেন?

লজ্জা পাবে বলে কিছু বলি না। মানুষ হয়ে জন্মেছে, ভুল তো করবেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে সানাউল্লাহ রাতে ঘুমুতে গেছেন। ঠাকুরমার ঝুলি থেকে হমডু-ডমরুকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন।

ক্রমে ক্রমে রাজার ছেলেরা বড় হইয়া উঠিল। পেঁচা আর বানরও বড় হইল। পাঁচ রাজপুত্রের নাম হইল— হীরারাজপুত্র, মানিকরাজপুত্র, মোতিরাজপুত্র, শঙখরাজপুত্র আর কাঞ্চন রাজপুত্র।

পেঁচার নাম হইল ভুতুম
আর
বানরের নাম হইল বুদ্ধু।...

এই সময় জাৰিনের টেলিফোন। সে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, টেলিফোন করে করে তোমাকে পাচ্ছি না। বাবা, কী করছ?

সানাউল্লাহ বললেন, গল্প পড়ে শুনাচ্ছিরে মা। তোকে যেমন শুনাতাম। ঠাকুরমার ঝুলি থেকে পড়ে শুনাচ্ছি।

কাকে পড়ে শোনাচ্ছি?

হমডু আর ডমরুকে।

জাবিন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কাকে?

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সানাউল্লাহ বললেন, নিজেকেই পড়ে শোনাচ্ছি। আর কল্পনা করছি তুই ঘুমঘুম চোখে পাশে আছিস।

জাবিন বলল, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তোমার সম্পর্কে শুনতে পাচ্ছি বাবা। মন অত্যন্ত খারাপ।

সানাউল্লাহ চিন্তিত গলায় বললেন, কী কথা শুনছিস?

জাবিন বলল, যারাই তোমার সঙ্গে মেশে তাদেরকেই তুমি পাগল বানিয়ে ছেড়ে দাও।

কাকে আবার পাগল বানালাম?

হামিদ মামাকে। উনি এখন রোজ সকালে নাশতার মতো একটা করে ব্যাটারি খান।

এটা তো জানতাম না।

আবু করিম চাচা তো মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একজন শুধু বাকি আছে। আইনুদ্দিন চাচা। বাবা, উনিও কি পাগল হয়ে গেছেন? ইন্টারনেটে দেখলাম তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কুবা চাচি তার সন্ধান চেয়ে সব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমাকে তো তুমি কিছুই জানাচ্ছ না।

সানাউল্লাহ বললেন, আইনুদ্দিন ভালো আছে। আমার বাড়িতেই লুকিয়ে w!

বলো কী! কেন?

জটিল একটা অংক ধরেছে। তার বাসায় অংকের পরিবেশ নেই।

কী অংক?

ভূতের একটা অংক। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে ভূত আছে কি নাই প্রমাণ হয়ে যাবে। সে ভূতের wave function তৈরি করে ফেলেছে।

জাবিন কাদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা কী হচ্ছে।

সানাউল্লাহ বললেন, কিছু হচ্ছে না তো মা। সব নরমাল।

তুমি কি ভালো আছি?

সানাউল্লাহ বললেন, আমি খুবই ভালো আছি। এমনিতেই ভালো ছিলাম, কবিগুরুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আরো ভালো লাগছে।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কার সঙ্গে কথা বলেছ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরকালে বসে উনি এখন নিজের পুরনো কবিতা কারেকশন করছেন। ঐ যে কবিতাটা আছে না—

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির

এখানে এক ফোঁটার জায়গায় এখন হবে দুফোঁটা। তোর কাছে সঞ্চয়িতা আছে না? কারেকশন করে ফেল।

জাবিন টেলিফোন রেখে দিল। ইন্টারনেট নিয়ে বসল। ঢাকায় আসার টিকিট কাটবে। আর দেরি করা যাচ্ছে না।

# ৯. সানাউল্লাহর সামনে রূপবতী

সানাউল্লাহর সামনে রূপবতী কিন্তু বামনটাইপ খাটো এক মেয়ে বসে আছে। সে নিজে খাটো, তার হাত-পাও খাটো। মেয়েটার চোখ পিটপিট রোগ আছে। সে ক্রমাগত চোখ পিটপিট করে যাচ্ছে। মেয়েটার গা থেকে ফিনাইলের কঠিন গন্ধ আসছে। মেয়েটা হোপ ক্লিনিকের নার্স। নাম রেনুকা। সে আবু করিমের একটা চিঠি নিয়ে এসেছে।

সানাউল্লাহ বললেন, মা, তোমার নাম?

মেয়েটা বলল, আমার নাম দিয়ে কী করবেন? চিঠি নিয়ে এসেছি চিঠি পড়েন। পুনশ্চ লেখাটা আগে পড়েন।

সানাউল্লাহ বললেন, নামটা বলে, আলাপ পরিচয় হোক।

মেয়েটা বলল, আলাপ পরিচয়ের কিছু নাই। আমার নাম রেনুকা। চিঠির পুনশ্চটা শুরুতেই পড়বেন। প্লিজ।

সানাউল্লাহ বললেন, পুনশ্চ শুরুতে পড়ব কেন? আগে চিঠি পড়ব, তারপর পুনশ্চ?

মেয়েটা বলল, পুনশ্চ পড়ে আমাকে আমার টাকাটা দিয়ে দিন। আমি চলে যাই। মর্নিং শিফটে আমার ডিউটি আছে। আরেকটা কথা, আমাকে চেক দিলে হবে না। নগদ টাকা দিতে হবে। ঘরে এত টাকা না থাকলে কাউকে ব্যাংকে পাঠিয়ে আনান।

সানাউল্লাহ বললেন, স্থির হয়ে বসো তো মা। এত নড়াচড়া করবে না। পুরো চিঠিটা আমাকে শান্তিমতো পড়তে দাও। তোমাকে টাকা দেবার ব্যাপার থাকলে টাকা দেয়া হবে।

সানাউল্লাহ চিঠি পড়া শুরু করলেন।

প্রিয় সানাউল্লাহ,

আমি মহাবিপদে আছি। এরা আমাকে জেলখানায় আটকে ফেলেছে। কোনো কারণ ছাড়াই রোজ রাতে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিচ্ছে। দিনে দিচ্ছে কড়া ঘুমের ওষুধ। আপত্তি করলেই বিছানার সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রাখছে। আমি শায়লার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। সম্ভব হয় নি।

এই ক্লিনিকের ব্যবসাই হচ্ছে রোগীকে আধাপাগল বানিয়ে চিকিৎসার নামে দীর্ঘদিন আটকে রাখা। যত বেশিদিন রাখতে পারে তাদের ততই লাভ।

আমি মানছি অচার নিয়ে আমার অবসেশন আছে। এই অবসেশনের অর্থ কি আমি ভায়োলেন্ট মানসিক রোগী? সানাউল্লাহ, তুমি আমাকে যেভাবেই পার নরক থেকে উদ্ধার করো।

ইতি
আবু করিম।

পুনশ্চ : যে মেয়েটি এই চিঠি তোমার হাতে দিবে তাকে দশ টাকা দিয়ে দিবে।

সানাউল্লাহ মানিব্যাগ খুলে দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলেন। রেনুকা হতভম্ব গলায় বলল, দশ হাজার টাকা দেবার কথা। দশ টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি নিজে পড়েছি দশ হাজার টাকী লেখা ছিল।

সানাউল্লাহ বললেন, হাজার শব্দটা কালি দিয়ে কাটা। তোমার হাতে যখন চিঠি দিয়েছে তখন আমার বন্ধু হাজার কেটে দিয়েছে। এই দেখ।

রেনুকা চোখ বড় বড় করে বলল, অতি বদলোক তো!

সানাউল্লাহ বললেন, বদ লোক না। অতি বুদ্ধিমান লোক। এমন একজন বুদ্ধিমান মানুষকে পাগল হিসেবে তোমরা আটকে রেখেছ। তুমি দশ টাকা নিয়ে বিদেয় হও। আরেকটা কথা, আমার বন্ধুকে তুমি যদি এখন কোনো ঝামেলা কর তাহলে তুমি নিজে বিরাট যন্ত্রণায় পড়বে।

কী যন্ত্রণায় পড়ব?

সেটা এখনো চিন্তা করি নাই। যাই হোক, চা খাবে? চা খেতে চাইলে চা খাওয়াতে পারি।

বেনুকা থমথমে গলায় বলল, চা খাব না।

সানাউল্লাহ বললেন, দশ টাকা পেয়ে তুমি মন বেশি খারাপ করে ফেলেছ। এটা তো মা ঠিক না। এই দশ টাকা রোজগার করতে একজন ভিক্ষুকের চার ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করতে হয়।

রেনুকা বলল, আমার উপর এত বড় চালাকি কেউ করে নাই।

সানাউল্লাহ বললেন, এতে তোমার খুশি হওয়া উচিত। চালাকের সঙ্গেই মানুষ চালাকি করে। বোকার সঙ্গে করে না। দশ টাকার ঘটনায় প্রমাণিত হলো তুমি বোকা না।

রেনুকা কোনো কথা না বলে ছুটে বের হয়ে গেল।

সানাউল্লাহ ঝিম ধরে বসে আছেন। বন্ধু আবু করিমকে কীভাবে জেল থেকে বের করবেন বুঝতে পারছেন না। ডা. জোহরা খানম কঠিন পনীর অর্থাৎ কঠিন চীজ। বিষয়টা নিয়ে যে আইনুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন তাও সম্ভব না। মানুষের জ্বর যেমন মাথায় উঠে যায় আইনুদ্দিনের অংক মাথায় উঠে গেছে। রেনুকা মেয়েটার গা থেকে যেমন ফিনাইলের গন্ধ আসছিল আইনুদ্দিনের গা থেকে এখন অংকের গন্ধ আসছে।

বাবা! তোমার কী হয়েছে?

সানাউল্লাহ চমকে তাকালেন। ভূত-কন্যা ডমরু তার কোলে বসে আছে। এই মেয়েটা তাকে প্রায়ই চমকাচ্ছে। যখন তখন কোলে এসে বসছে। ঘাড় ধরে ঝুলছে। ডমরুকে আজ কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে। সানাউল্লাহর চমকে ওঠার এটাও একটা কারণ। মডু ডমরু সবসময় এক চেহারায় দেখা দেয় তা-নী। একেক দিন একেক চেহারায় উদয় হয়।

সানাউল্লাহ তাঁর বিপদের কথা বললেন। ডমরু বলল, তুমি হামিদ চাচার কাছে যাও, উনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

সানাউল্লাহ ভূত-মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউ নটি ভূত গার্ল। ভালো বুদ্ধি দিয়েছ।

হামিদুর রহমান পরিচিত কাউকে সেইভাবে চিনতে না পারলেও সানাউল্লাহকে চিনলেন। এবং আনন্দিত গলায় বললেন, কেমন আছ? তোমার নাম ভুলে গেছি কিন্তু চেহারা মনে আছে। তুমি জাবিনের বাবা হয়েছে?

জি হয়েছে।

ব্যাটারি চিকিৎসা চলছে তো। এই চিকিৎসায় এখন অনেক সুস্থ আছি। স্মৃতিশক্তি অনেকটাই ফিরেছে।

সানাউল্লাহ বললেন, আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি।

হামিদ বললেন, আমার কোনো আত্মীয়স্বজন আমার কাছে কাজে আসবে আর আমি মুখ ফিরিয়ে থাকব— এই ঘটনা কোনোদিন ঘটবে না। বলো কী কাজ?

সানাউল্লাহ বললেন, এই চিঠিটা একটু পড়েন ভাইজান।

হামিদ চিঠি পড়ে বললেন, কে আছ গাড়ি বের কর। Action Action Direct Action. আমি জাবিনের বাবাকে নিয়ে জিপে করে যাব। পেছনে আসবে মাইক্রোবাস। মাইক্রোবাসে যারা সবসময় থাকে তারা থাকবে। শুধু রব্বানি যেন না যায়। এর মাথা অতিরিক্ত গরম। একে যতবার নিয়ে গেছি বিপদে পড়েছি।

ডা, জোহরা খানমের সামনে হামিদুর রহমান এবং সানাউল্লাহ বসা। জোহরা খানম চোখ সরু করে তাকিয়ে আছেন। তিনি খবর পেয়েছেন ক্লিনিকের গেটের দুজন দারোয়ান কিছুক্ষণ আগে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। ক্লিনিকের ভেতর একটা মাইক্রোবাস ঢুকেছে। বাসভর্তি সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজন। রিসিপশনে যে মেয়েটা বসে ছিল সে জানালা খুলে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে পা ভেঙেছে। তাকে তিন নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে। জোহরা খানম ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি শীতল গলায় বললেন, আপনারা কী চান?

হামিদ বললেন, আপনার ক্লিনিকের নামডাক শুনেছি। ভর্তি হওয়ার জন্যে এসেছি। আমাকে একটা ভিআইপি কেবিন দিন। আমি ভিআইপি পারসন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

জোহরা খানম বললেন, ভর্তি হতে চাইলেই তো ভর্তি হওয়া যায় না। আপনার সমস্যা কী, কেন ভর্তি হতে চাচ্ছেন, তা জানতে হবে।

হামিদ বললেন, আমার ব্যাটারি খাওয়া রোগ হয়েছে। সকালে নাশতার সঙ্গে একটা ব্যাটারি খাই। দেশী কিংবা চায়নিজ ব্যাটারি খেতে পারি না। স্টমাক আপসেট হয়। তবে আমেরিকান বা জার্মান ব্যাটারিতে সমস্যা হয় না।

জোহরা খানম বললেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনারা আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন। ভয়টা কেন দেখাতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। চাদা চান? যে প্রতিষ্ঠান মানসিক রোগীদের সমস্যায় নিবেদিত, তার কাছ থেকেও চাদা তুলবেন?

সানাউল্লাহ বললেন, ম্যাডাম, চাঁদা তুলতে আসি নি। আপনার প্রেসার মাপার যন্ত্রটা দিন। প্রেসার মাপার যন্ত্রে হাত দিয়ে বলব, ইহা সত্য। আমার প্রেসারের সমস্যা আছে। কাজেই প্রেসার মাপার যন্ত্রে হাত রেখে মিথ্যা বলব না।

হামিদ বলল, চড়-থাপ্পড় দেয়ার জন্যেও আসি নাই। মেয়ে হচ্ছে মাতৃজাতি। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। হাদিসের কথা।

তাহলে চান কী?

হামিদ বললেন, কী চাইতে এসেছি এখন ভুলে গেছি। বেশিক্ষন আমার কোনো কথা মনে থাকে না। যদিও ব্যাটারির চিকিৎসা চলছে। তবে এই চিকিৎসার ফল বেশিক্ষণ থাকে না। অবশ্যি চিন্তার কিছু নাই। আমার ভাই সঙ্গে আছে, সে আমাকে মনে করিয়ে দিবে। এবং যথাসময়ে Action নেয়া হবে। Action Action Direct Action. ম্যাডাম, কিছু মনে নিবেন আমি মাঝে মাঝে স্লোগান দিব। পলিটিক্যাল লোক তো। স্লোগান না দিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না।

জোহরা খানব বিড়বিড় করে বললেন, Oh God!

হামিদ সানাউল্লাহর দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, কী জন্যে অ্যাকশনের ঘোষণা দিয়েছি কিছুই ঘরে নাই। সানাউল্লাহ কানে কানে মনে করিয়ে দিলেন।

জোহরা খানম বললেন,আমি ধৈর্যের শেষ সীমানায় উপস্থিত হয়েছি। পুলিশ ডাকা ছাড়া এখন আর আমার হাতে Optionনাই।

হামিদ বলেন, অবশ্যই পুলিশ ডাকবে। আপনাকে ডাকতে হবে না। আমিই ডেকে দিব। ম্যাডাম, মেয়েছেলেরা অনেক ধৈর্যশীল হয়। আপনার ধৈর্য কম। এর একমাত্র কারণ আপনার গোঁফ। গোঁফের জন্যে আপনার মধ্যে কিছু পুরুষস্বভাব চলে এসেছে। পুরুষদের ধৈর্য কম হয়। হয় আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠেভকরে ফেলবেন।ধৈর্য ফিরে পাবার এইটাই একমাত্র পথ।

জোহরা খানম থমথমে মুখে হাতে টেলিফোন নিলেন। নিচু গলায় কিছু কথা বললেন। কী কথা কার সঙ্গে কথা কিছুই বুঝা গেল না। দুটা শব্দ শুধু বুঝা গেল। চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসী হামিদ মোটেই বিচলিত হলেন না।

হামিদের একজন এ্যাসিসটেন্ট দরজায় উঁকি দিল। খড়খড়া গলায় বলল, ওস্তাদ কিছু লাগবে?

হামিদ বললেন, একটা ওয়ান টাইম ব্লেজার নিয়ে এসে যায় গোঁফ ফেলে দিতে রাজি হয়েছেন। আর বিশেষ পানি লাগবে এক গ্লাস।

অ্যাসিসটেন্ট দ্রুত বের হয়ে গেল। জোহরা বেগম বলনে, থানার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ চলে আসবে।

হামিদ বললেন, রাস্তায় যেমন যানজট, একঘণ্টার আগে পুলিশ আসবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। এর মধ্যে লক্ষ্মী মেয়ের মতো গোঁফ ফেলে দিন। আপনার জন্যে পানি আনা হবে। দৈনিক জাত গ্লাস পানি খাওয়া দরকার। পানি যত খাবেন তত ভালো। এর মধ্যে ওসি সাহেবের সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগ করে তাড়াতাড়ি আসতে বলুন। আমার নামটা বলুন। আমার নাম কমিশনার হামিদ। বাজারে প্রচলিত নাম চ্যাপ্টা হামিদ। অথচ আমার মধ্যে চ্যাপ্টা কিছুই নাই।

রিসিপশনিস্টের ঘর থেকে বিকট ঝনঝন শব্দ হলো। মনে হচ্ছে টিভি ভাঙা হয়েছে। পিকচার টিউব ফাটলে এমন বিকট আওয়াজ হয়।

ওয়ান টাইম রেজার এবং এক গ্লাস পানি চলে এসেছে। জোহরা খানম দ্বিতীয় দফায় থানায় টেলিফোন করলেন। চ্যাপ্টা হামিদ শব্দ দুটা কয়েকবার শোনা গেল। টেলিফোন বার্তা শেষ হবার পর জোহরা খানমের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। তাঁর কথাবার্তাও খানিকটা জড়িয়ে গেল। তিনি হাতে ওয়ানটাইম রেজার নিতে নিতে বললেন, আপনারা যা বলছেন তা যদি করি তাহলে কি আপনার বিদায় হবেন?

হামিদ দরাজ গলায় বললেন, অবশ্যই। আমি ওয়ান ওয়ার্ড ম্যান। এক কথার মানুষ।

সানাউল্লাহ বললেন, আমরা শুধু যাওয়ার সময় আপনাদের একজন পেশেন্টকে সঙ্গে নিয়ে যাব। পেশেন্টের নাম আবু করিম।

জোহরা খানম বাথরুমে ঢুকে গেলেন। বাথরুম থেকে বের হবার পর তাঁকে অদ্ভুত দেখাতে লাগল। হামিদ বললেন, গোঁফ থাকা অবস্থাতেই তো ভালো ছিল। এখন উনার চেহারায় বার বাদর ভাব চলে এসেছে। যখন গোফ ছিল তখন সবাই তাকিয়ে থাকত গোঁফের দিকে। এখন গোঁফ ফেলে দেবার কারণে পুরো মুখ একসঙ্গে চোখে পড়ছে বলে এই অবস্থা। যাই হোক, ম্যাডাম গ্লাসের পানিটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলুন। আমরা বিদায় হই।

বিনাবাক্য ব্যয়ে জোহরা খানম পানির গ্লাস শেষ করলেন। হামিদ উঠে দাড়াতে দাড়াতে বললেন, আপনাকে দেয়া হয়েছিল কমোডের পানি। এটা আমার শাস্তির একটা অংশ। মেয়েছেলের গায়ে তো হাত তুলতে পারি না। কমোডের এক গ্লাস পানি খাইয়ে দেই। সপ্তাহখানিক কিছু খেতে পারবেন না। ক্রমাগত বমি করবেন। তারপর ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।

হামিদের কথা শেষ হবার আগেই জোহরা খানম টেবিল ভাসিয়ে বিকট শব্দে বমি করলেন। রিসিপশনিস্টের ঘরের টেলিভিশনের পিকচার টিউব ফাটার সময় যে আওয়াজ হয়েছিল তারচেয়েও বড় আওয়াজ হলো।

শব্দ কী কারণে হয়েছে দেখার জন্যে ভীত চোখে যে নার্স উঁকি দিল তার নাম রেনুকা।

সানাউল্লাহ আনন্দিত গলায় বললেন, রেনুকা! মা কেমন আছ?

রেনুকা জবাব দিল না। আতঙ্কে তার চোখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। সানাউল্লাহ বললেন, আমার বন্ধু আবু করিমের মতো রোগী এখানে কয়জন আছে ঠিকমতো বলো। পাগল না অথচ পাগল বানিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে।

রেনুকা বলল, তিনজন।

সানাউল্লাহ বললেন, এই তিনজনকে দ্রুত ছাড়ার ব্যবস্থা কর। আমাদের মাইক্রোবাস আছে, মাইক্রোবাসে তুলে দাও। অর্ডার তোমার ম্যাডামই দিতেন। উনি বৃমির ওপর আছেন। অর্ডার দেয়ার মতো অবস্থা তাঁর না।

রেনুকা তাকালো জোহরা খানমের দিকে। জোহরা খানম কিছু একটা বলতে গিয়ে আবারো বিকট শব্দে বমি করলেন।

হামিদ বললেন, এই ক্লিনিকে যারা কাজ করছে সবাই দোষী। প্রত্যেককেই বিশেষ পানি খাওয়া উচিত। অপরাধের শাস্তি। রেনুকা মা! তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে তা কর। তারপর তুমি নিজেই কমোড থেকে এক কাপ পানি তুলে খেয়ে ফেলবে। তোমাকে মা ডেকে ফেলেছি এইজন্যে কনসেশন। আমার সামনে পানি তুলবে, আমার সামনে খাবে। ঠিক আছে লক্ষ্মী মা আমার?

# ১০. জাবিন দুবাই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে এসেছে

জাবিন দুবাই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে এসেছে। সেখান থেকে খুশি খুশি গলায় বাবাকে টেলিফোনে জানিয়েছে, বাবা, আর মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সানাউল্লাহ বললেন, একা আসছিস না-কি জামাইও সঙ্গে আছে?

জাবিন বলল, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ঢাকায় অনেক কাজকর্ম, তাকে সেইসব দেখতে হবে।

ঢাকায় আবার কী কাজকর্ম?

জাবিন বলল, তুমি ভুলে গেলে! তোমার জমিটা ডেভেলপারকে দিতে হবে? ওদের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে না?

সানাউল্লাহ বললেন, তাই তো। তাই তো। ভুলে গিয়েছিলাম।

তুমি আছ কেমন বাবা?

আমি ভালো আছি। হমডু ডমরু ভালো আছে। হমডু গতকাল বৃষ্টিতে ভিজছে বলে ক্রমাগত হাঁচি দিচ্ছে। এমন অবাধ্য হয়েছে। বললাম বৃষ্টিতে ভিজবি না।

আবার হমডু-ডমরু?

আচ্ছা থাক হমডু-ডমরুর কথা। আর কিছু জানতে চাস?

আবু করিম চাচার শরীরের অবস্থা কেমন?

খুবই ভালো।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন?

যেভাবে ছাড়া পাবার কথা সেভাবে ছাড়া পায় নি। আমি আর তোর হামিদ আংকেল আমরা ধমকাধমকি দিয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে এসেছি।

কী বলছ এসব?

সানাউল্লাহ বললেন, পুলিশ তোর হামিদ আংকেলকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। এই নিয়ে সামান্য ঝামেলা হয়েছে। তোর হামিদ আংকেল অ্যারেস্টের সময় বিএনপির পক্ষে একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে এখন তিনি আওয়ামী লীগের। অ্যারেস্টের সময় সাংবাদিকরা ছিল তো। সব পত্রিকায় ছবিসহ ছাপা হয়েছে। আওয়ামী নেতারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। তারা। এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটা বিএনপির একধরনের কারসাজি। তারা হামিদকে আওয়ামী লীগের কর্মী বলে প্রচার করতে চাচ্ছে, আসলে তিনি কখনো আওয়ামী লীগে ছিলেন না।

অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলছ বাবা।

সানাউল্লাহ বললেন, অদ্ভুত কথা কিছু বলছি নারে মা। পুলিশ আমাকেও খুঁজছে।

কী বলছ তুমি?

তোর হামিদ আংকেলের সঙ্গে আমিও তো ছিলাম। তবে তোর চিন্তার কিছু নাই। পুলিশ আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি পলাতক।

কোথায় পালিয়ে আছ?

সেটা তো মা তোকে বলা যাবে না। শেষে পুলিশের চাপে তুই বলে ফেলবি। রিমান্ডে নিয়ে গেলে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। জেলে যেতে আমার কোনো সমস্যা নেই। হমভূ-ডমরুকে নিয়ে সমস্যা। বিনা কারণে ওরা কেন আমার সঙ্গে জেল খাটবে? আরে শোন, তুই কোনো চিন্তা করবি না। বাসায় রফিক আছে।

বলেই সানাউল্লাহ টেলিফোন রেখে দিলেন। এখন কথা বাড়ানো মানেই ঝামেলা।

নরুন্দ সাহেব কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। রাগে গনগন করছেন। কথাও ঠিকমতো বলতে পারছেন না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখে থুথু এসে পড়ছে।

নরুন্দ বললেন, আপনি কী মনে করে চার লোক নিয়ে আমার বাড়িতে এসে উঠলেন? কোন সাহসে এই কাজটা করলেন। আমার বাড়িটা কি সরাইখানা?

সানাউল্লাহ হাসি হাসি মুখে বললেন, এরা সবাই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, একজন ডাক্তার। বাকি দুজনের পরিচয় এখনো জানি না। এই দুজন এখনো ঘোরের মধ্যে আছেন। ঘোর কাটলেই পরিচয় পাব। তবে এই দুজনও বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বিশিষ্ট ব্যক্তির আমি কেঁথা পুড়ি।

সানাউল্লাহ বললেন, শুধু শুধু কথা পুড়বেন কেন স্যার? আমরা একটা ঘরে সবাই থাকব। কথায় আছে না, যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় নজন। আমরা মাত্র পাঁচজন।

আমি আপনার সুজন।

আপনার কথা বলছি না স্যার। আমরা পাঁচ বন্ধু সুজন। আমাদের একটা ঘর। দিলেই চলবে। আর কিছু লাগবে না। মেঝেতে পার্টি পেতে সবাই শুয়ে থাকব।

আমার ঘর কোথায় যে থাকবেন?

বসার ঘরে শুয়ে থাকব। এবং তার জন্যে পেইং গেস্ট হিসেবে আপনাকে টাকা দেব।

এই কথায় নরুন্দ খানিটা নরম হলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, পার পারসন কত করে দেবেন।

সেটা স্যার আপনি ঠিক করে দিন। ফুড এন্ড লজিং। বাইরে হোটেলে খাওয়া আমাদের জন্যে সমস্যা। খাওয়া নিয়ে চিন্তা করবেন না। যা খেতে দিবেন তাই খাব। সিম্পল ডাল-ভাতও চলবে। আমাদের কাছে নানা ধরনের আচার আছে। আচার দিয়ে খেয়ে ফেলব।

জনপ্রতি প্রতিদিন একহাজার করে টাকা দিতে হবে। রাজি আছেন কিনা বলুন। এক পয়সা কম হবে না।

সানাউল্লাহ বললেন, আমি রাজি। শুধু একটা অনুরোধ, আমার সঙ্গে দুটা ভূতের বাচ্চা থাকবে। ওদের ফ্রি করে দিতে হবে।

নরুন্দ হতভম্ব গলায় বললেন, ফাজলামি করছেন?

সানাউল্লাহ বললেন, ফাজলামি করব কেন স্যার? এই যে এরা দুজন আপনার সামনেই আছে। দুই ভাইবোন। ভাইটার নাম হমডু, বোনটার নাম ডমরু। এই তোমরা সালাম দাও। ইনি বিখ্যাত ভূত বিশেষজ্ঞ নরুন্দ সাহেব।

নরুন্দ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। সানাউল্লাহ বললেন, স্যার, এরা আপনাকে সালাম দিয়েছে।

নরুন্দ বললেন, আপনার চেহারা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে আপনি বিরাট এক ফাজিল লোক। মায়ের কাছে মাসির গল্প ফেঁদেছেন। আমার কাছে ভূতের বাচ্চার গল্প।

সানাউল্লাহ বললেন, এই মুহূর্তে আপনি ওদের দেখতে পারছেন না কারণ এরা দেহধারণ করে নি। আপনার উগ্র মেজাজ দেখে ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে এরা দেহধারণ করতে পারে না।

নরুন্দ হুঙ্কার দিলেন, Stop your cheater.

সানাউল্লাহ চুপ করে গেলেন। হমডু ডমরু ভালো ভয় পেয়েছে। দুজনই লাফ দিয়ে সানাউল্লাহর কোলে উঠে পড়েছে। ডমরু নানা ভঙ্গিমায় নন্দ সাহেবকে ভেংচি দিচ্ছে। রক্ষা যে তিনি সেই ভেংচি দেখছেন না। দেখতে পেলে তাঁর খবর হয়ে যেত।

পত্রিকায় সানাউল্লাহর হাসি হাসি মুখের ছবি ছাপা হয়েছে। ছবির ওপরে লেখা–

এঁকে ধরিয়ে দিন।
সমাজের উপকার করুন।

বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ডাক্তার জোহরা খানম এবং তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ হিসেবে বলা হয়েছে সানাউল্লাহ নামের এই লোক ক্লিনিকে শুধু যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে তা-না, ক্লিনিকের প্রতিটি সদস্যকে কমোডের নোংরা পানি খেতে বাধ্য করেছে। ক্লিনিকের তিনজন ভয়ঙ্কর মানসিক রোগীকেও নিয়ে পালিয়ে গেছে।

পত্রিকা কোলে নিয়ে জাবিন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। জাবিনের পাশে তার স্বামী মাসুদ। রফিক দুজনকেই চা দিয়েছে। জাবিন চায়ের কাপে চুমুক দেয় নি। মাসুদ তৃপ্তির সঙ্গেই চা খাচ্ছে। মাসুদ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছু মনে করো না। তোমার বাবা অতি বিপদজনক একজন ব্যক্তি।

জাবিন বলল, আমার বাবা বিপদজনক ব্যক্তি?

হ্যাঁ। তুমি আমার কথায় রাগ করবে, তারপরেও বলি–যে মানুষ দেশে বিপদজনক সে বিদেশেও বিপদজনক।

জাবিন বলল, তুমি চাচ্ছ না যে আমার বাবা বিদেশে যাক? সে তার মেয়ের সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাক।

মাসুদ বলল, আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন হলো No. তিনি যে ধরনের মানুষ তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হবে। সেই সময় তোমার নেই। আমারও নেই।

জাবিন বলল, আমার চার বছর বয়সে মা মারা গেলেন। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। আমাকে একা বড় করেছেন। তিনি তার জীবনটা দিয়ে দিলেন আমার জন্যে। তার উত্তরে আমি কী করলাম? বাবাকে ফেলে রেখে বিদেশে সুখের সংসার পাতলাম।

মাসুদ বলল, ইমোশনাল কথাবার্তা বলার তো এখানে কিছু নাই। পুরো ব্যাপারটা আমাদের র‍্যাশনালি দেখতে হবে। তোমার বাবার আছে তার জীবন। আমাদের আছে আমাদের জীবন।

জাবিন চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। রফিককে বলল, রফিক! আমার জন্যে একটা ইয়েলো ক্যাব নিয়ে এসো।

মাসুদ বলল, কোথায় যাচ্ছ?

জাবিন বলল, হামিদ চাচার কাছে যাচ্ছি। বাবার ঘটনাটা কী জানি।

চল আমিও যাচ্ছি।

জাবিন বলল, তোমাকে যেতে হবে না। বাবা যে কী পরিমাণ বিপদজনক মানুষ এটা তুমি গবেষণা করে বের কর।

হামিদ জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। ত্রিশটা গাঁদা ফুলের মালা এবং দুটা টাকার মালা গলায় পরিয়ে তাকে জেল গেট থেকে খোলা জিপে তোলা হলো। তিনি হাসিমুখে সবার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন। জিপ কিছুক্ষণ চলার পরই তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন না-কি জেলে যাচ্ছেন। রব্বানি তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। ইচ্ছা করলেই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তা তিনি করলেন না। নেতার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে শুনলে শিষ্যদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। তিনি আদুরে গলায় ডাকলেন, রব্বানি!

রব্বানি বলল, জি ওস্তাদ।

হামিদ বললেন, ওস্তাদ বলবা না রব্বানি! ওস্তাদ বললে নিজেকে ট্রাক ড্রাইভার ট্রাক ড্রাইভার লাগে। এখন থেকে যতবার রব্বানি বলব তারই জি নেতা! বলে সাড়া দিবে।

অবশ্যই।

রব্বানি।

জি নেতা।

হামিদ জনগণের উদ্দেশ্যে চলন্ত জিপ থেকে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, রাজনীতিতে সবসময় নতুন কিছু করতে হয়। যেই নতুন কিছু করবে পাবলিক খাবে। সামনের ডাস্টবিনে কাক কা কা করছে, দেখেছ?

জি নেতা।

কাকদের দেখে মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সব নেতার কাঙালি ভোজন করান। আমি করাব কাক ভোজন। গরুর মাংসের তেহারি বানিয়ে সব ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে দিয়ে আসবে।

কবে করব?

আমার জন্মদিনে করবে। তবে আমার জন্মদিন কেউ জানে না। আমিও জানি। তোমরা বিবেচনা করে একটা তারিখ বের কর। আবার খেয়াল রেখ গুরুত্বপূর্ণ কোনো তারিখের সঙ্গে যেন ক্ল্যাশ না করে। বুঝতে পারছ?

পানির মতো পরিষ্কার। ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট এইসব তারিখ বাদ।

হামিদ ঘরে ফিরে দেখেন জার্কিন মুখ শুকনা করে বসে আছে। তিনি আনন্দে অভিভূত হলেন। হামিদ চিরকুমার মানুষ। জাবিন তার কাছে কন্যার চেয়েও বেশি। জাবিন কদমবুসি করতেই তার চোখে পানি এসে গেল।

জাবিন বলল, আপনার শরীরের এই অবস্থা কেন চাচা? গালটাল ভেঙে কি হয়েছে। চোখের নিচে কালি!

হামিদের মনে হলো তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কেউ কোনোদিন বলে নি তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ। এই মেয়েটা বলছে। হামিদ বললেন, জনগণের সেবা করতে গিয়ে এই অবস্থা মা।

জাবিন বলল, অনেক জনগণের সেবা করেছেন। আর লাগবে না। আমি বাবার সঙ্গে আপনাকেও অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাব। এখানে আপনার দেখাশোনার কেউ নেই। বাকি জীবন আমি আপনাদের দেখাশোনা করব।

হামিদের চোখে দ্বিতীয়বার পানি এসে গেল।

জাবিন বলল, আপনার জন্যে কিছু উপহার এনেছি, দেখুন পছন্দ হয় কি না। এটা ভেড়ার লোমের গায়ের চাদর। এটা মানিব্যাগ। সাধারণ মানিব্যাগ না। এর ভেতর ট্রেকিং ডিভাইস

আছে। ধরুন মানিব্যাগ চুরি গেল, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে খুঁজে বের করা যাবে কোথায় আছে। একটা সোলার এনার্জি টর্চলাইট এনেছি। ব্যাটারি ছাড়া চলবে।

দুপুর তিনটা বাজে। জাবিন ফেরে নি। মাসুদ একাই খেতে বসেছে। রফিক যত্ন করে খাওয়াচ্ছে। রফিকের রান্না ভালো।

দুলাভাই, আচার দিব? আচার দিয়া খাবেন?

মাসুদ বলল, দাও। বিদেশে থেকে আমার দিয়ে ভাত খাওয়া ভুলে গেছি। বিদেশ হচ্ছে সসের দেশ। সস কি কোনোদিন বাঙালি আচারের ধারেকাছে আসতে পারে?

মাসুদ তৃপ্তি করে আচার দিয়ে ভাত খেল। আচারটা অতিরিক্ত ঝাল, কিন্তু খেতে অসাধারণ। মাসুদ বলল, এটা কিসের আচাররে?

রফিক বলল, পিঁপড়ার আচার।

পিঁপড়ার আচার মানে?

রফিক বলল, করিম স্যার বানায়েছেন। এই আচারের নাম পিপিলিকা ক্রন্দন।

মাসুদ বলল, যেগুলিকে আমি রসুনের খোসা মনে করছি সেগুলি পিঁপড়া?



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রফিক নির্বিকার ভঙিতে বলল, জি দুলাভাই। নজর কইরা দেখলেই বুঝবেন।

মাসুদ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। রফিক বলল, বমি করবেন দুলাভাই? চিলুমচি আনি?

হামিদ জাবিনকে নিয়ে খেতে বসেছেন। তিনি বললেন, তোর বাবাকে পুলিশ খুঁজছে এটা কোনো বিষয়ই না। আগামীকালের মধ্যে রীট করে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিব। তাতেও সমস্যা হলে গোপনে আগরতলা পাচার করে দিব। আগরতলায় আমার নিজের কেনা বাড়ি আছে। লোকজন আছে। কোনো অসুবিধা হবে না। বৎসরের পর বৎসর থাকতে পারে। তোর বাবা করেছেটা কী? মার্ডার।

জাবিন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এইসব কী বলছেন চাচা! বাবা মার্ডার করবে কেন?

হামিদ বললেন, করলেও সমস্যা নাই। আমি আছি না? আমার উপর ভরসা রাখতে বল। আগরতলা পৌঁছামাত্র তার রেশন কার্ড হয়ে যাবে। ভোটার তালিকায় নাম উঠানোর ব্যবস্থা করব। ইন্ডিয়ান নাগরিক হিসাবে বাকি জীবন সেখানে থাকবে। হিন্দু ব্রাহ্মণ! নাম হরি ঠাকুর।

জাবিন বলল, চাচা, আপনার মাথা তো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।

হামিদ বললেন, নষ্ট হবার পথেই ছিল। ব্যাটারি চিকিৎসার কারণে এখনো কিছুটা কনট্রোলের মধ্যে আছে। ভালো কথা, তোর বাবা কাকে মার্ডার করেছে? গুরুত্বপূর্ণ কেউ না তো?

জাবিন বাসায় ফিরল সন্ধ্যার দিকে। মাসুদ বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে। তার মুখ থমথমে। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা হারা ভাব। জেট লেগের কারণে ঘুমে চোখে জড়িয়ে আসছে, তারপরেও সে জেগে আছে। জাবিনের সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। বারান্দায় বসে জাবিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি হবে তার রিহার্সেল দুবার দিয়েছে। রিহার্সেলে মনে হয় কাজ হবে না। আসল সময়ে এলোমেলো হয়ে যাবে। তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

জাবিন বারান্দায় উঠে এসে বলল, হ্যালো।

মাসুদ তার পাশের চেয়ার দেখিয়ে বলল, জাবিন! কথা আছে বসো।

জাবিন বসতে বসতে বলল, দুপুরে ঠিকমতো খেয়েছ?

মাসুদ বলল, আচার দিয়ে একগাদা ভাত খেয়েছি। প্রতিটি আইটেম সুস্বাদু ছিল।

জাবিন বলল, গুড।

কিসের আচার দিয়ে ভাত খেয়েছি জানতে চাও?

জাবিন বলল, জানতে চাচ্ছি না। তুমি আরাম করে খেয়েছ এটা ইম্পর্টেন্ট। আমের আচার দিয়ে খেয়েছ না-কি মরিচের আচার দিয়ে খেয়েছ সেটা ইম্পর্টেন্ট না।

মাসুদ ঠাণ্ডা গলায় বলল, ইম্পর্টেন্ট। আমি পিঁপড়ার আচার দিয়ে খেয়েছি। কালো পিঁপড়ার আচার।

কী বললে?

কি বলেছি তুমি শুনেছ। দ্বিতীয়বার বলতে পারব না। আমি তোমার বাবাকে বিপদজনক মানুষ বলেছিলাম বলে তুমি রাগারাগি করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে। এখন বুঝেছ কেন বিপদজনক বলেছি? যে মানুষের ঘরে তিন বোতল পিঁপড়ার আচার সে কি বিপদজনক না।

জাবিন চুপ করে রইল। মাসুদ বলল, একজন সাধু পুরুষ আসেপাশে সাধু নিয়ে চলাফেরা করে। একজন বিপদজনক মানুষের আশেপাশে থাকে বিপদজনক মানুষ। কাজের ছেলে রফিক হচ্ছে তার উদাহরণ।

সে কী করেছে?

আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে চলে গেছে। কাগজে কী লেখা পড়ে দেখ। মাসুদ পকেট থেকে কাগজ বের করে জাবিনের হাতে দিল। সেখানে লেখা

দুলাভাই,

সালাম নিবেন। আপনার সাথে আমার পুষতেছে না। কাজেই চলিয়া গেলাম। স্যার ফিরত আসিলে আবার আসিব ইনশাল্লাহ।

ইতি

রফিক মিয়া

জাবিন বলল, রফিক চলে গেছে?

মাসুদ বলল, খালি হাতে যায় নি। আমার হ্যান্ডব্যাগ এবং একটা স্যুটকেস নিয়ে চলে গেছে। এই ছেলে আগেও চুরি করেছে। তোমার পিতা সব জেনেশুনে তাকে আবার রেখেছেন। কারণ তিনি বিপদজনক মানুষ। তিনি বিপদ পছন্দ করেন।

জাবিন বলল, বার বার বিপদজনক মানুষ বিপদজনক মানুষ বলার তো দরকার নেই। একবার বলেছ শুনেছি।

মাসুদ বলল, তোমার প্রতি আমার সাজেশন হচ্ছে— তুমি বাংলাদেশে তোমার বাবার সঙ্গে থেকে যাও। মহাবিপদ টেনে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাবার কিছু নেই। তুমি দেশে থেকে বাবার সেবা কর। তোমার ভূত ভাই এবং ভূত বোনের সঙ্গে সময় কাটাও। তোমার জন্যে ভৌতিক পরিবারই দরকার।

জাবিন বলল, কী বলতে চাচ্ছ পরিষ্কার করে বলো। তুমি আমার সঙ্গে বাস করতে চাচ্ছ না?

মাসুদ বলল, আমাদের আলাদা থাকাই বাঞ্ছনীয়। তোমার সঙ্গে থাকা মানে তোমার পিতার সান্নিধ্যে থাকা। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। কিছু মনে করো না, আমি চলে যাচ্ছি একটা হোটেলে গিয়ে উঠব।

জাবিন বলল, আমি কী করব?

মাসুদ বলল, তুমি তোমার বাবার বাড়ি পাহারা দেবে। ভূত ভাইবোনদের নিয়ে সাপলুডু খেলবে।

জাবিন বলল, সামান্য একটা পিঁপড়ার আচার খেয়ে তোমার এই অবস্থা? মাসুদ কঠিন গলায় বলল, পিঁপড়ার আচার হয়তো সামান্য, কিন্তু পিঁপড়ার আচারের উদ্ভাবক সামান্য না। তিনি অসামান্য। আমি অসামানার সঙ্গে নেই। তাছাড়া পুলিশ উনাকে খুঁজছে। উনাকে না পেয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের পুলিশ এই কাজটা করে। মূল আসামিকে না পেলে আত্মীয়স্বজন ধরে নিয়ে রিমান্ডে পাঠিয়ে দেয়। আমি হোটেল সোনারগাঁয়ে রুম বুক করেছি, ছয়শ তেইশ নাম্বার রুম। তুমি যদি তোমার বিপদজনক বাবার কথা ভুলে গিয়ে আগামী পরশু অস্ট্রেলিয়া ফেরত যেতে রাজি থাক, তাহলে হোটেলে চলে আস। চিন্তা করার জন্যে তোমাকে বারো ঘণ্টা সময় দিলাম।

জাবিন বলল, ইউ গো টু হেল।

মাসুদ বারান্দা থেকে নামল। শান্ত ভঙ্গিতে গেট পার হয়ে রাস্তায় নামল। ইয়েলো ক্যাব ডেকে উঠে পড়ল।

জাবিন প্রথম কিছুক্ষণ কাঁদল। চেষ্টা করল বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার। রিং হয় কেউ ধরে না। খালি বাড়িতে তার ভয় ভয় করতে লাগল। শেষে তার হামিদ চাচাকে টেলিফোন করে বলল, চাচা, আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যান।

হামিদ সব কথা শুনে বিরক্ত গলায় বললেন, কান্নাকাটি বন্ধ কর তো মা। জামাইকে টাইট দেবার ব্যবস্থা করছি। এক ট্রিটমেন্টে তোর জামাই সরলরেখা হয়ে যাবে।

তুমি কী করবে?

আমি কী করব সেটা আমার ব্যাপার। তুই আজ সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়। কলি তোর অনেক কাজ।

কী কাজ?

হামিদ বললেন, কাল আমি কাকভোজন করাচ্ছি। ঢাকা শহরের যত কাক আছে সবাইকে তেহারি খাওয়ানো হবে। বাবুর্চি হাজি কাল্লু মিয়া রাঁধবেন। তুই থাকবি তদারকিতে।

রাত দশটায় রমনা থানার ওসি সাহেবের সঙ্গে হামিদ টেলিফোনে কথা বললেন। তিনি বললেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার ভাইস্তি তার স্বামীকে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে কী এক কারণে ঝগড়া হয়েছে। জামাই একা উঠেছে হোটেল সেনারগাঁয়ে। রুম নাম্বার ছয়শ

তেইশ। এরপর থেকে আমার ভাইস্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিশ্চিত আমার ভাইস্তিকে খুন করে ডেডবডি বুড়িগঙ্গায় ফেলা দেয়া হয়েছে।

ওসি সাহেব বললেন, বলেন কী!

আপনি তদন্ত করলেই মূল ঘটনা বের হয়ে যাবে।

রাত এগারোটায় সোনারগাঁ হোটেলের বার থেকে মাসুদকে পুলিশ গ্রেফতার করল। মাসুদ তখন দুটা বিয়ার এবং চার পেগ ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কি খেয়ে পুরোপুরি আচ্ছান্ন। ওসি সাহেব বললেন, আপনার স্ত্রীর ডেডবড়ি কোথায়?

মাসুদ বলল, আমার স্ত্রীর ডেডবডি আমার স্ত্রীর কাছে। এটা সবার জন্যেই সত্য। আমরা সবাই আমাদের ডেডবডি সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। এটাই মানবজাতির নিয়তি।

ওসি সাহেব বললেন, ডেডবডি কি বুড়িগঙ্গায়?

মাসুদ বলল, বুড়িগঙ্গা বলা ঠিক না। নদী কখনো বুড়ি হয় না। নদী চিরযৌবনা। দয়া করে বলুন তরুণীগঙ্গা। এটা অপিনার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ।

# ১১. হোপ ক্লিনিক

হোপ ক্লিনিক থেকে যে তিনজনকে বের করে আনা হয়েছে তাদের একজন ডা. আবু করিম। দ্বিতীয়জনের পরিচয় জানা গেছে। তার নাম ইসমাইল হোসেন। তিনি হোসেন গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজের মালিক। তার ব্যবসায়ের পার্টনার বাল্যবন্ধু সোবাহান এবং স্ত্রী জাহানারা এই দুজন শলাপরামর্শ করে তাঁকে হোপ ক্লিনিকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গত কারণেই ইসমাইল তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। ইসমাইল হোসেনের সন্ধান চেয়ে সব বড় বড় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। সন্ধানদাতাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

নরুন্দ সন্ধান জানেন? জিনিস তাঁর বাড়িতেই আছে। সন্ধান দিয়েই টাকাটা হাতিয়ে নেয়া যায়। তিনি অপেক্ষা করছেন। তার ধারণা পুরস্কারের টাকা আরো বাড়বে। তার ধারণা মিথ্যা না।

তৃতীয়জনের জবুথবু ভাব এখনো কাটছে না। তিনি তার নামও বলছেন না। তবে তিনিও যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা তাঁর হাভভাবে বুঝা যাচ্ছে।

আজ নরুন্দের বাড়িতে প্রেতচক্রের আসর বসেছে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে আহ্বান করা হবে। তার বিশেষ কারণ আছে। আইনুদ্দিনের অংক খানিকটা জট পাকিয়ে গেছে। সমাধান এসেছে ভূত হলো ০ গুণন ০ গুণন দশমিক ০০.

তিনি মানুষের একটি সমীকরণও করেছিলেন। তার উত্তর এসেছে ০০ গুণন দশমিক ০.

আইনস্টাইনকে কাগজপত্রগুলি দেখালে যদি কিছু হয়।

অল্পসময়ের মধ্যেই চক্র সরব হলো। নরুন্দ গোঁ গোঁ করা শুরু করলেন। নরুন্দের অ্যাসিসটেন্ট তৃপ্তির গলায় বলল, স্যার এসে গেছেন প্রশ্ন করুন। সানাউল্লাহ বললেন, স্যার! আপনি কি এসেছেন।

হুঁ।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা একটা ভূতের অংক শেষ করেছি। কাগজপত্রগুলি আপনাকে একটু দেখাব।

নরুন্দ গোঁ গোঁ করতে করতে বললেন, কাগজপত্র আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। আমি আইনস্টাইন না। আমি তাঁর ছোট ভাই। আমার নাম রাইনস্টাইন।

সানাউল্লাহ বললেন, জনাব আপনার পড়াশোনা কোন লাইনে?

কোনো লাইনেই না। আমি মানসিক প্রতিবন্ধী। গোঁ গোঁ গোঁ।

নরুন্দের পাশেই বসেছিলেন আবু করিম। তিনি বললেন, ফাজলামির জায়গা পাও না। ভূতের ব্যবসা শুরু করেছে। গোঁ গোঁ বন্ধ। বন্ধকরলেথাবড়ায়াবিন্ন করাইলের বাচ্চা

নরুন্দ বলল, গালাগালি করছেন কেন? পরকাল, চক্র এইসব বিশ্বাস না করার অধিকার আপনার আছে কিন্তু চক্রে বসে মিডিয়ামের মাধ্যমে আত্মানি অতিপ্রাচীন এক পদ্ধতি।

আবু করিম নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আচমক এক চড় লাগিয়ে দিলেন। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, তুই তোর ঘরে যা। কাল তোকে আমরা পুলিশে ধরিয়ে দেব। ব্যাটা বদের বাচ্চা।

দুঃখিত, ব্যথিত এবং আহত নরুন্দ চক্র ছেড়ে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন দুটি বাচ্চা তাঁর বিছানায়। একটছলো একটা মেয়ে মেয়ে বিছানায় বসে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ছেলেটা বিছানা থেকে প্রায় দুই ফুট উঁচুতে ভাসছে।

নরুন্দ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তোমরা কে?

শূন্যে ছেলেটি বলল, আমার মামাহমড়া আর আমার বোন এর নাম ডমরু। আমরা ভূতের বাচ্চা।

জীবনে প্রথম ভূত দেখে নরুন্দ মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন। এই গোঁ গোঁতে ভেজাল নেই। একশ পারসেন্ট আসল।

এখন কথা হচ্ছে নরুন্দ কি আসলেই কিছু দেখেছেন? না-কি এটা তার কল্পনা? বলা অত্যন্ত মুশকিল। নরুন্দের অ্যাসিসটেন্ট আসগর তার গুরুকে হোপ ক্লিনিকে ভর্তি করেছে। গুরু চিকিৎসায় আছেন। আসগর তাঁর গুরুকে নিয়ে বেকায়দায় আছে। ক্লিনিকে তিনি বেশির ভাগ সময় সুস্থ থাকেন, তবে মাঝে মাঝে তাঁর উপর 'বাংলা ভাই'য়ের প্রেতাত্মার ভর হয়। তখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে।

সবচেয়ে বেকায়দায় আছে মাসুদকে নিয়ে পুলিশ। রিমান্ডে গিয়ে মাসুদ শুধু যে তার স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করছে তা-না। শ্বশুর হত্যার দায়ও স্বীকার করেছে। একজনের ডেডবড়ি সে না-কি বুড়িগঙ্গায় ফেলেছে, আরেকজনেরটা শীতলক্ষায়। এখানেই শেষ না, মাসুদ দশট্রাক অস্ত্রমামলায় তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে। উদিচি গ্রেনেড হামলায় সে নিজে অংশগ্রহণ করেছে এরকমও বলেছে।

একমাত্র আনন্দে আছেন হামিদ সাহেব। তিনি ঠিক করেছেন একজীবনে তিনি যা উপার্জন করেছেন তার সবই কাকদের সেবায় ব্যয় করবেন। কারণ তার সব অর্থই অসৎ অর্থ। ভালো কোনো কাজে এই অর্থ ব্যয় করা যাবে না। বরং কাকদের জন্যে কিছু করা দরকার। তিনি তার কলাবাগানের তিনতলা বাড়ির নাম দিয়েছেন কাককুঠির। তিনি তাঁর অ্যাসিসটেন্ট রব্বানিকে ডেকে বলেছেন তার মুত্যুর পর যেন কবরে লেখা হয়—

এখানে শুয়ে আছেন
কাকদের নয়নের মণি
দেশখ্যাত কাকদরদী নেতা
হামিদুর রহমান

**পরিশিষ্ট**

মাসুদ স্ত্রী এবং শশুর হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েও জেলে আছে। কারণ দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা এবং উদিচি গ্রেনেড হত্যা মামলায় পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে পত্রিকায় খবর আসছে বিদেশী নাগরিক জনাব মাসুদ দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা এবং উদিচি গ্রেনেড হামলা মামলায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সানাউল্লাহ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে কোথায় আছেন কেউ জানে না। একদিন শুধু জাবিন টেলিফোন পেল–মা, মহাবিপদে আছি। আগে শুধু ডমরু বাবা ডাকতো এখন হমডুও বাবা ডাকা শুরু করেছে। এবং দুই ভাইবোনই ঘোষণা দিয়েছে তাদের বাবা-মা ফিরে এলেও তার বাবা-মার কাছে যাবে না। কী যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। মহাবিপদে পড়েছি।